আয়াতুল কুরসী ৩৬০ বার পাঠ করে দুআ করবে এবং নিজের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট, বালা মুসীবতের জন্য আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করবে। ইনশাআল্লাহ সকল দুঃখ কষ্ট ও বালা মুসীবত দূর হয়ে যাবে।

উলামাগণ এই আয়াতে কারীমার অসংখ্য ফাযায়েল লিখেছেন। বিশেষতঃ রাতে ঘুমানোর আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে সীনায় দম করলে মানুষ দুঃস্বপ্ন, পেরেশান খেয়াল ও চুরি-চামারী থেকে নিরাপদ থাকে। করুণাময় আল্লাহ তার জান-মাল, পরিবার-পরিজন ও বাড়ী ঘরের হিফাযত করেন। কেননা, তিনিই তো সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা দানকারী। তিনিই সর্বোত্তম মাওলা ও সর্বোত্তম সাহায্যকারী। আর এ আয়াতে এই শিক্ষারই ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ -

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, তিনি জীবিত ও সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন? তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না কিন্তু তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলিকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান। – সূরা বাকারা ঃ আয়াতঃ ২৫৫

আল্লামা মুহাম্মদ আল জাযরী (রহঃ) বলেন, যে মাল বা সন্তানকে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে দম দেওয়া হবে অথবা লিখে মালের ভেতর ও সন্তানের গলায় রেখে দেওয়া হবে, শয়তান সেই মাল বা সন্তানের কাছেও পৌছতে পারবে না।

–হিসনে হাসিন

সূরা ইখলাস

রোগমুক্তির জন্য

সূরা ইখলাস পবিত্র কুরআনের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা। এর ছোট্ট ছোট্ট পাঁচটি আয়াত রয়েছে। শব্দ সংখ্যা মাত্র পনেরটি। অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই সূরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যেই এই সূরাকে সুলুসে কুরআন বা কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। বহু উলামায়ে কেরামের অভিমত হল এই যে, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এই সূরা তেলাওয়াত করবে সে সামগ্রিক কল্যাণ লাভ করবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেক অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে। আল্লামা বোনী (রহঃ) নিজের হাজত পুর্ণ হওয়া ও রোগ মুক্তির জন্য নিম্নোক্ত তরীকা উল্লেখ করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ اَحَدٌ لَا تُسَلِّطْ عَلَىَّ اَحَدًا وَلَا تُحْوِجْنِىْ اِلٰى اَحَدٍ وَاَغْنِنِىْ يَا رَبِّ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ بِفَضْلِ -

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - يَا مَنْ هُوَ قَدِيْمٌ وَّدَائِمٌ وَّيَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اَوَّلُ يَا اٰخِرُ اِقْضِ حَاجَتِىْ يَا فَرْدُ يَا صَمَدُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ

আয়াতে শেফা

প্রত্যেক রোগের জন্য

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত ছয়খানি আয়াতে কারীমাকে আয়াতে শেফা বা রোগ মুক্তির আয়াত বলা হয়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) স্বীয় "শিফাউল আলীল" নামক কিতাবে এই আয়াতগুলির খুবই তারীফ করেছেন। এইগুলি কুরআনুল হাকীমের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আয়াত। বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতেহাসহ এই আয়াতগুলি পাঠ করে রুগ্ন ব্যক্তির উপর দম দিবে অথবা চীনা মাটির বাসনে লিখে পানির দ্বারা ধৌত করে রোগীকে পান করাবে। ইনশাআল্লাহ যে কোন রোগ আরোগ্য হবে।

ছয়টি আয়াত এই–

(١) وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

(٢) وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ

(٣) يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

(٤) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

(٥) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

(٦) قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ

আয়াতে কেফায়াতে মুহিম্মাত

(সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তার জন্য)

কুরআনুল হাকীমের নিম্নোক্ত সাতটি আয়াতে কারীমাকে আয়াতে কেফায়াতে মুহিম্মাত বা সকল প্রকার বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভের আয়াত বলা হয়। এই মহান আয়াতগুলি দ্বারা যাবতীয় বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকা যায়। এই আয়াতে কারীমাগুলি পাঠ করার মানে নিজের জন্য সার্বিক নিরাপত্তা হাসিল করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দ্বীনি ও দুনিয়াবী ব্যাপারে এই সাতটি আয়াতের চেয়ে উত্তম আর কোন বিষয়ই হতে পারে না। এই সাতটি আয়াতে কারীমা প্রত্যেকদিন সাতবার পড়া উচিত। বুযুর্গানে দ্বীন শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফও পাঠ করতেন।

সাতটি আয়াতে কারীমা এই–

(١) اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا۔

(٢) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا۔

(٣) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا۔

(٤) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا۔

(٥) وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

(٦) وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

(٧) مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

فَسَهِّلْ يَا اِلٰهِىْ كُلَّ صَعْبٍ * بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ سَهِّلْ

দশটি 'ক্বাফ'' অক্ষর বিশিষ্ট পাঁচটি আয়াত

(দীর্ঘ জীবন সুস্বাস্থ্য ও বরকতের জন্য)

পবিত্র কুরআনে এমন পাঁচটি আয়াত রয়েছে যার প্রত্যকটি আয়াতে দশটি করে ''ক্বাফ'' অক্ষর আছে। এ গুলির রহস্য ও উপকারিতা অসংখ্য।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন এই পাঁচটি আয়াত লিখবে এবং ধুয়ে পানি পান করবে তার হাজার শেফা, হাজার স্বাস্থ্য ও হাজার রহমত হাসিল হবে। হাজার নরমী, হাজার ইয়াক্বীন ও হাজার নুর তার ভেতরে প্রবেশ করবে। যাবতীয় রোগ ব্যাধির দুঃখ কষ্ট ও চিন্তা পেরেশানী তার থেকে বের হয়ে যাবে।– তাফসীরে কাওয়াসী

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রশ্নের জওয়াবে ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলি পাঠ করবে তার হায়াত দীর্ঘ হবে, তার গুনাহ মাফ হবে এবং তার উদ্দেশ্য সফল হবে। –তাফসীরুল আরায়েশ

মর্যাদাপুর্ণ পাঁচটি আয়াত এই–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰٓى اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا

تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَنْ لَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ -

(٢) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ -

(٣) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا -

(٤) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ -

(٥) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا

(٦) قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (قَيُّوْمٌ يُّرْزَقُ مَنْ يَّشَآءُ الْقُوَّةَ -)

রোগ-ব্যাধি ও ক্ষতিগ্রস্ততার প্রতিকার

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ একদা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। এসময় একজন ভগ্ন হৃদয় জীর্ণশীর্ণ ব্যক্তির উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এ অবস্থা কি করে হল? লোকটি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! রোগ-ব্যাধি ও ক্ষয় ক্ষতির কারণে আমার এ অবস্থা হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কালিমা শিখিয়ে দেবনা যা তোমার রোগ ও ক্ষয়-ক্ষতি দূর করতে পারে?

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অনুরোধে এ আয়াত আমাকে শিখিয়ে দেনঃ

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

অর্থাৎ "আমি সেই মহান সত্তার উপর ভরসা রাখি, যিনি জীবিত, যার মৃত্যু নাই, এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।" – সূরা বনী ইসরাইল ঃ আয়াত ১১১

চিন্তা ও পেরেশানীর প্রতিকার

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রহঃ) বলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন চিন্তা ও পেরেশানী দেখা দিলে তিনি এই দুআ করতেন ঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

অর্থাৎ "হে চিরঞ্জীব , হে চিরন্তন! তোমার অনন্ত রহমতের অছিলায় প্রার্থনা করছি।" – হাকেম, তিরমিযী শরীফ

দুআ ইউনুস (আঃ)

হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াককাস (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে এই দুআ পাঠ করেছিলেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

"আপনি ছাড়া কোন মাবূদ নাই। আপনি পাক ও পবিত্র। নিশ্চয় আমি যুলুম করেছি।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দুআ কি হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জন্যই খাছ ছিল, না সাধারণ মুমিনদের জন্যেও এই দুআ প্রযোজ্য? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আল্লাহ তাআলার এই আয়াত শুননি?

فَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

"আমি তাঁর (হযরত ইউনুস (আঃ)-এর দুআ কবূল করেছি ও তাঁকে এই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং আমি এভাবেই মুমিনদেরকে মুক্তি দেই।"

মনোবেদনা ও অস্থিরতার প্রতিকার

মানুষ স্বভাগতভাবেই অত্যন্ত দুর্বল ও স্পর্শকাতর। তার সকল প্রকার শক্তি সামর্থের পরও সে এতো দুর্বলচিত্ত যে সামান্য বিষয়ই তাকে বেদনাক্লিষ্ট ও ব্যাকুল করে তোলে। তবে আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দাগণ বড় বড় অঘটন দুর্ঘটনার পরও ভগ্নহৃদয় ও ব্যাকুল হয়ে যান না। আমাদের সম্মানিত বুযুর্গগণ এই মনোবেদনা ও চিত্তের অস্থিরতা দূর করার বিভিন্ন দুআর তালীম দিয়েছেন। স্বয়ং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, এরূপ মনোবেদনার কোন কারণ ঘটলে নিম্নোক্ত দুআ পড়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। – বুখারী শরীফ

দুআটি এই–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনের দুঃখ-কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করার জন্য এই দুআ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا -

দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তার তদবীর

নিম্নোক্ত দশটি সূরা, আয়াত, দুআ ও দরূদ শরীফ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে সাত বার পাঠ করা অত্যন্ত উপকারী। – কুওয়াতুল কুলূব

(১) সূরা ফাতেহা (২) সূরা নাস (৩) সূরা ফালাক্ব (৪) সূরা ইখলাস (৫) সূরা কাফেরূন (৬) আয়াতুল কুরসী (৭) কালিমায়ে তামজীদ (৮) এই দরূদ শরীফ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ حَبِيْبِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

(৯) এই দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ وَرَافِعُ الدَّرَجَاتِ يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

(১০) এবং

اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِىْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّاٰجِلًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ اَهْلُهٗ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ جَوَّادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

যে কোন রোগ-ব্যাধি ও ব্যথার জন্য এই তাবীয লিখে গলায় বেঁধে রাখলে খুবই উপকার পাওয়া যায়ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَّهَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

রোগীর উপর দম দেওয়া

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী হুযুরের সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখার জন্য তাশরীফ নিয়ে আসেন। তিনি বললেন, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আমার উপর যে দম করেছিলেন–আমি কি তোমার উপর সেই দম করব না? আমি আরয করলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনি অবশ্যই দম করুন। অতঃপর তিনি এই দুআ পড়ে আমার উপর দম করেন। –হাকেম, ইবনে মাজাহ

দুআটি এই–

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيْكَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের কালিমাগুলি পাঠ করে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ)-এর উপর দম করেছিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُّؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَّ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ

চোখের দৃষ্টি শক্তি

(১) হযরত লাইস ইবনে সাআদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত উক্ববা ইবনে নাফে (রহঃ)কে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়াতে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে চোখের দৃষ্টিশক্তি কিভাবে দান করলেন? তিনি জওয়াব দিলেন, আমাকে স্বপ্নে একজন লোক কিছু কালিমা পড়তে বললেন। আমি কালিমাগুলি পাঠ করার পর আল্লাহ তা'আলা আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। কালিমাগুলি হল এই –

يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا سَمِيْعَ الدُّعَاءِ يَا لَطِيْفًا لِّمَا يَشَاءُ اُرْدُدْ عَلَيَّ بَصَرِيْ

(২) খাজা ফরীদুদ্দীন (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি নিম্নের আয়াতটি ৭ বার এবং তার সাথে ৭ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে নখের উপর ফুঁক দেবে এবং নখ দিয়ে চোখের উপর মসেহ করবে তার চোখের দৃষ্টি কখনো নষ্ট হবে না।

আয়াত খানি এই–

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) ও স্বীয় "কাওলুল জামীল" কিতাবে এই তদবীরের উল্লেখ করেছেন।

كهٰيعص ـ حٰمٓ عسق

"হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি উপরোক্ত দশটি অক্ষরের একেকটি অক্ষর মুখে উচ্চারণ করবে এবং একেকটি আঙ্গুল বন্ধ করবে। এভাবে এক হাতের দশটি আঙ্গুল বন্ধ হয়ে গেলে তা চোখের উপর ফেরাবে, ইনশাআল্লাহ তার চোখের রোগ সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়ে যাবে।

–সিয়ারুল আওলিয়া

মাথা ব্যথা, দাঁত ব্যথা ও চোখের ব্যথা

(১) হযরত জাফর সাদেক (রহঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেছেন, মাথা ব্যথার জন্য এই দুআটি ৭ বার পড়ে মাথা হাতিয়ে দেবে ঃ

(١) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ سَكَنَ لَهٗ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(২) আধ-কপালী ব্যথার জন্য আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত গুণবাচক পবিত্র নামগুলি লিখে মাথার উপর বেঁধে দিলে ব্যথার উপশম হবে ইনশাআল্লাহ!।

(٢) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَافَتَّاحُ يَا وَهَّابُ يَا رَحِيْمُ

(৩) দাঁত ব্যথার জন্য একটি কাগজের টুকরায় নিম্নোক্ত আয়াতখানি লিখে যে দাঁতে ব্যথা তার উপর রেখে দিবে।

(٣) لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

(৪) ইমাম শাফী (রহঃ)–এর নিকট এক ব্যক্তি চোখের ব্যথার অভিযোগ করলে তিনি একটি কাগজে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ

লিখে দিয়ে বললেন, এটা মাথায় বেঁধে রাখ। এতে আল্লাহর ইচ্ছায় সে ব্যক্তির চোখের ব্যথা ভাল হয়ে যায়।

নারীদের জন্য বিশেষ তদবীর

(১) প্রসব বেদনা ঃ কোন মহিলার প্রসব বেদনা উঠলে কাগজের টুকরায় এই আয়াতটি লিখে এটাকে পাক কাপড়ে পেছিয়ে মহিলার বাম রানে বেঁধে দেবে। দ্রুত সন্তান প্রসব হয়ে যাবে।

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اهيا اشراهيا

(২) হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) বলেন, আমাকে একজন অতি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলেছেন যে, যদি কোন মহিলার সন্তান প্রসবের পর জীবিত না থাকে তাহলে আজওয়াইন (উগ্রগন্ধ লতাবিশেষের বীজ) ও গোল মরিচ নিয়ে সোমবার দুপুর সময় ৪০ বার সূরা শামস পড়বে। প্রত্যেক বার আগে ও পরে দরূদ পাঠ করবে। অতঃপর আমলের দিন থেকে শিশুর দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত প্রতি দিন খাবে। ইনশাআল্লাহ এই মহিলার সন্তান স্বাভাবিক জীবন লাভ করবে।

শিশুদের হিফাযতের জন্য

(১) হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নে উল্লেখিত দু'আটি পাঠ করে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাযিঃ) এর শরীরের উপর

দম দিতেন এবং তিনি বলতেন যে, তোমাদের দাদা হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল এবং হযরত ইসহাক (আঃ) ও এই দুআ পাঠ করতেন। –মুসলিম শরীফ

আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গদের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুল আযীয ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক (রহঃ) শিশুদের হেফাযতের জন্য শুধু এই দুআটিই লিখে দিতেন। এই দুআটি যদি কাগজে লিখে শিশুর গলায় বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ চাহেন তো শিশু সর্বদিক থেকে নিরাপদ থাকবে।

দু'আটি এই

(১) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ

(২) বদ নযেরর জন্য শুরু ও শেষে দরূদ শরীফসহ নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে শিশুর উপর দম করবে।

(২) وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ـ

বদ নযর থেকে আত্মরক্ষার তদবীর

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاٰى شَيْئًا يُعْجِبُهٗ فَخَافَ اَنْ يَّعِيْنَهٗ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَلَا اَخِيْرَهٗ ـ

হাকীম ইবনে হেযাম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জিনিস দেখতেন এবং এটা তাঁর নিকট খুব ভাল লাগত, তখন তাঁর ভয় হত যে, পাছে আবার বদ নযর লেগে না যায়। তাই তিনি বলতেন, আয় আল্লাহ! আপনি এতে বরকত দান করুন এবং এটাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন। – মুসলিম শরীফ

হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সুনানে নাসায়ী ও ইবনে মাজায় হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ নিজের মধ্যে, নিজের মালের মধ্যে বা অপর কোন মুসলমান ভায়ের মধ্যে এমন কোন জিনিস দেখ, যা তার খুবই পছন্দ

হয় তখন তার মধ্যে বরকতের জন্য দুআ করা উচিত। কেননা, নযর লাগার বিষয়টি খুবই সত্য।

উপরোক্ত দুইটি পবিত্র বাণী থাকার পর নযর লাগার ব্যাপারে কোন প্রকার শুবা সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নাই। নযর লাগার বিষয়টি কোন কল্পকাহিনী বা রূপকথা নয়। বরং এটা একটা অতি বাস্তব ব্যাপার।

অধুনা দেহতত্ত্ববিদগণও এই সত্যটি স্বীকার করে নিয়েছেন। বস্তুতঃ হ্যাফনাটিজমের ভিত্তিই চোখের আকর্ষণ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নযর লাগার মন্দ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য যে দুআ শিক্ষা দিয়েছেন, চিন্তা করে দেখুন তা কত সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক।

অধ্যায়ঃ ৬

পানাহারের আদব

আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানাহারের আদব সম্পর্কে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট হেদায়াত রেখে গেছেন।

কিভাবে খানা খাবে? প্রথমে কি করবে? খানার জন্য বসার পদ্ধতি কি হবে? খাদ্য কি পদ্ধতিতে আহার করবে? একত্রে খাওয়ায় কি কি বরকত রয়েছে? অন্যকে খানার মধে শরীক করায় কেমন বরকত? খানার পূর্বে এবং পরে কোন্ কোন্ দোয়া পাঠ করা সুন্নত? মোটকথা খানা সম্পর্কে সম্ভাব্য যত প্রকার প্রশ্নই হোক না কেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর মধ্যে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট জওয়াব ও সমাধান রয়েছে।

খানার আদব ও উপদেশ সম্পর্কিত তিব্বে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই অধ্যায়টি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী এবং আমলী নমুনার অন্তর্ভুক্ত।

হালাল খাদ্য

কোন খাদ্য জায়েয অথবা নাজায়েয হওয়ার মৌলিক শর্ত দুটি। প্রথমটি হলো খাদ্য হালাল হওয়া। দ্বিতীয়টি হলো পবিত্র হওয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا .....

"হে মানব! জমিনে যা কিছু রয়েছে তা থেকে হালাল ও পবিত্র জিনিসগুলি খাও।" –সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ১৮৬

(১) হালাল ঃ ঐ সকল জিনিসকে বলে যা শরীয়ত অনুমোদিত। এবং তা গ্রহণ করাকে শরীয়ত নিষেধ করে নাই। যেমন দুধ, ঘি, ফল, শাক-সব্জি, হালাল জীব-জন্তুর গোশত ইত্যাদি। তবে শরয়ী অনুমোদনের সাথে সাথে উক্ত হালাল বস্তু অবশ্যই জায়েয পন্থায় অর্জিত হতে হবে। নাজায়েয পন্থায় উপার্জিত অথবা প্রাপ্ত হলে চলবে না। যেমন চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, ছিনতাই, অথবা কোন নাহক পন্থায় অর্জিত জীবিকা হালাল নয়।

(২) পবিত্রতা ঃ খাদ্য হালাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় শর্ত হলো, তা পবিত্র হতে হবে। কারণ কোন বস্তু যতই হালাল এবং বৈধ উপায়ে তা অর্জিত হোক না কেন, যদি এর মধ্যে নাজায়েয নাপাক কিছু মিশ্রিত হয়ে যায় তবে তা আর

জায়েয থাকে না। নিম্নের উদাহরণ দ্বারা উক্ত শর্তটি সুস্পষ্ট করা হলো। মোরগ একটি হালাল প্রাণী। শরীয়ত এর গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। তথাপি তা বৈধ হওয়ার জন্য চুরিকৃত না হওয়া, অবৈধ পন্থায় উপার্জিত না হওয়া, মৃত না হওয়া বরং নিয়মানুযায়ী জবাইকৃত হওয়া শর্ত। এমন কি উক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি গোশতের ডেগের মধ্যে নাপাকী পতিত হয় তবে সমস্ত গোশতই নাপাক হয়ে খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে যায়। কতইনা পরিতাপের বিষয় উচু তলার লোকদের জন্য যাদের থেকে হারাম হালালের পার্থক্য একেবারে উঠেই গেছে। তবে সাধারণ লোকদের মধ্যে এ বিষয়ে কিছু সতর্কতা দেখা গেলেও তারা জায়েয নাজায়েযের প্রতি তেমন খেয়াল করে না। আর পাক-নাপাকের প্রতি তো সাবধানতা মোটেই নাই।

কতিপয় হারাম খাদ্য

(১) মৃত জীব-জন্তু ঃ

ইরশাদ হচ্ছেঃ .... إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

"নিঃসন্দেহের তোমাদের উপর মৃত প্রাণীর গোশত হারাম করা হয়েছে।"
–সূরাহ বাকারা আয়াতঃ ১৭৩

হারাম প্রাণীর মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ঃ

(ক) জবাই ব্যতীত রোগ অথবা অন্য কোন কারণে স্বাভাবিক মৃত প্রাণী।
(খ) গলাটিপে মারা প্রাণী।
(গ) আঘাত লেগে মৃত্যু হয়ে যাওয়া প্রাণী।
(ঘ) উপর থেকে পড়ে মৃত্যুবরণকারী প্রাণী।
(ঙ) শিং এর আঘাতে মৃত্যু হওয়া প্রাণী।
(চ) বন্য বা হিংস্র জন্তুর খাওয়ার কারণে মৃত্যুবরণকারী প্রাণী।
(ছ) কোন পূজা বা বলীর বেদীর উপর জবাই কৃত প্রাণী।
(জ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাইকৃত প্রাণী।

হারাম প্রাণী সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত স্থানসমূহে রয়েছে।

সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭৩
সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ঃ ৩
সূরা আনআম ঃ আয়াত ঃ ১১৮, ১৬১, ১৫৪
সূরা নাহল ঃ আয়াত ঃ ১১৫

মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া নিষেধ। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে বড় হেকমত নিহিত রয়েছে। যদিও আমরা এই হেকমত বুঝতে সক্ষম নই তবুও আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনের মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

নিম্নের বিষয়গুলির কারণে প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে। * বার্ধক্য, শারীরিক দুর্বলতার কারণে ক্রমে এতে দুর্বল হয়ে পড়ে যে, তার জীবনীশক্তিই রহিত হয়ে যায়।

* শারীরিক অসুস্থতার কারণে শরীর এবং গোশতে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা সৃষ্টির ফলে মৃত্য হয়

* বাহ্যিক দুর্ঘটনা অথবা অভ্যন্তরীণ বিষাক্ত পয়জনে মৃত্যু হয়।

* কোন বিষাক্ত প্রাণী সাপ ইত্যাদির দংশন মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে।

উপরোল্লেখিত যে কোন কারণেই মৃত্যু হোক না কেন মৃত প্রাণীর মাংসে বিষাক্ত পয়জন, দুষিত রক্ত এবং ক্ষতিকর পয়জন ও জীবাণুর সমাবেশ ঘটে। ফলে তা কেউ ভক্ষণ করলে শারীরিক রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া যে সকল প্রাণীর মৃত্যু জবাই ছাড়া হয় ও রক্ত প্রবাহিত না হয় তার বিষাক্ত জীবানু শরীরে থেকে যায়। আর যে সকল প্রাণী দেব-দেবীর নামে অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা হয় এরূপ জন্তুর গোশত খেলে আকীদা নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মৃত জন্তুর গোশত হারাম করে দিয়েছেন।

কতিপয় হারাম খাদ্যের বর্ণনা

(২) শূকরের মাংস

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

"তোমাদের উপর মৃত প্রাণী, রক্ত এবং শুকরের মাংস হারাম করা হয়েছে, (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ঃ ১৭৩)

এ আয়াত ছাড়াও শূকরের মাংস হারাম হওয়ার হুকুম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ঃ ৩, সূরা আনআম ঃ আয়াত ঃ ১৪৫, সূরা নাহল ঃ আয়াত ঃ ১১৫ ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং সীমাতীত অপবিত্র ঘৃণিত জন্তুর মাংস সম্পুর্ণরূপে হারাম বলেছেন। তাই মজুবত

আকীদার মুসলমানগণের নিকট এটা এত ঘৃণিত যে, উক্ত জন্তুটির নাম লওয়াকেও তারা সহ্য করতে পারে না। সূরা আনআমের ১৫৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এটাকে 'রিজসুন' এবং ফুসুক অর্থাৎ সীমাহীন অপবিত্র ও আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী বলে উল্লেখ করেছেন।

শূকর পৃথিবীর নাপাক প্রাণীকুলের অন্তর্ভুক্ত একটা ঘৃণিত প্রাণী। এটা ময়লা আবর্জনার উপর মুখ লাগাতে থাকে, নাপাকী খায়, নোংরা স্বভাব বিশিষ্ট, এর মধ্যে নাই লজ্জা শরমের কোন বালাই, মেজাজ সাংঘাতিক উগ্র, আর রক্ত ক্ষতিকর জীবাণুর ভান্ডার এবং মাংস রূহানী এবং শারীরিক ক্ষতির মূল।

শূকরের গোশত সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের অভিমত খুবই শিক্ষাপ্রদ। গবেষণায় জানা গেছে যে, ক্রমাগত এই গোশত ব্যবহারে চর্ম রোগ, যকৃৎ এবং নাড়ীর রোগ, আমাশয়, পাতলা পায়খানা, মূত্র থলীর সমস্যা, পেটে ক্রিমির আধিক্য, হৃদরোগ ও ক্যান্সার হয়ে থাকে। এবং মাংস থেকে সৃষ্ট পোকা নাড়ী এবং রক্তে প্রবেশ করে মস্তিষ্কে পৌঁছে মৃগী রোগ সৃষ্টি করে। এবং চর্বি ব্যবহারে রক্তে কোলিস্টোল বেড়ে যাওয়ায় রক্তবাহী ধমনী (শিরা) সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং শিরা সংকুচিত হওয়ায় রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে। যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে অবশ্যই প্যারালাইসিস অথবা মানসিক রোগ দেখা দেয়। সচরাচর শূকরের মাংস ভক্ষণকারীদের চামড়ার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা সৃষ্টি হয় যা একটা স্থায়ী চর্মরোগের আকার ধারণ করে। এ ছাড়াও শূকরের মাংস খাওয়ায় ছোট বড় আরো অনেক প্রকার রোগ হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআন মজীদ ছাড়াও ইঞ্জিল শরীফেও শূকরকে হারাম বলা হয়েছে। কিন্তু আজ সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে শূকরের মাংস প্রিয় হয়ে উঠেছে এবং তাদের দেখা দেখি প্রাচ্য দেশগুলিও এর প্রতি ধাবিত হচ্ছে। এটা সম্পুর্ণরূপে প্রমাণিত বাস্তব একটা বিষয় যে, শূকরের মাংসভোজী জাতি এবং গোত্র উক্ত বেহায়া জন্তুর মতই নির্লজ্জ ও বেশরম, কারণ মাদী শূকর একটি মাত্র পুরুষ শূকরের সঙ্গমে গর্ববতী হয় না। বরং তাদের গর্ভধারণের জন্য একটার পর একটা শূকরের বারবার সঙ্গমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনেক পশুও এমন নির্লজ্জতা পছন্দ করে না।

সুতরাং শূকরের মত জানোয়ার যার মাংস ভক্ষণে রূহানী এবং চারিত্রিক রোগ সৃষ্টি হয়, এর ধারে কাছে যাওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

কতিপয় হারাম খাদ্য

(৩) রক্ত

পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য মৃত জীব এবং রক্ত হারাম করেছেন।" সূরা বাকারা ঃ আয়াত ঃ ১৭৩

খানা-পিনার বস্তুর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের হারাম হল রক্ত। মৃত্যু প্রাণী এবং শূকুরের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত হারাম হওয়া সম্পর্কেও বারবার আলোচনা এসেছে।

(حَرَام - حَرَم) এবং (مَحْرُوْم) এই তিনটি শব্দ একই শব্দ মূল বা ধাতু থেকে এসেছে।

(حَرَم) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে নিষেধের অর্থ কখনো এর সম্মানের কারণে ও হতে পারে যেমন বাইতুল্লাহ শরীফের হারাম ইত্যাদি। নিষিদ্ধতার দ্বিতীয় কারণ হলো এর নিকৃষ্টতা। যেমন মৃত প্রাণীর মাংস, শূকর, কুকুর এবং রক্ত ইত্যাদি হারাম হওয়া।

মূলত রক্ত শরীরের সকল জীবাণু, বিষাক্ত পদার্থ, ক্ষতিকর প্রভাব এবং রোগ বহনকারী। রক্তের তীব্রতা ও উষ্ণতার দ্বারাই এই ক্ষতিকর প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা রক্তকে হারাম আখ্যায়িত করে স্বীয় হেকমতের মাধ্যমে মানুষের উপর বড় মেহেরবানী করেছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রক্ত পানকারীর নাড়ীতে পৌঁছে তার জীবানুগুলি ইমোনিয়া সৃষ্টি করে। ফলে যকৃৎ দুষণ এবং বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

শরাব একটা হারাম পানীয়

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

...... فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ -

"নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারী শয়তানের গর্হিত কর্ম। তোমরা এগুলি হতে সম্পূর্ণ দূরে থাক, তোমাদের মঙ্গল হবে। শয়তান মদ এবং জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও

নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে চায়। এখনও কি তোমরা ফিরে আসবে না।" –সূরা আনআম ঃ আয়াত ঃ ৯০-৯১

অন্যস্থানে আল্লাহ তা'আলা মদ এবং জুয়া সম্পর্কে বলেছেন যে, ("হে নবী!) আপনার কাছে (মানুষ) মদ এবং জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করছে, আপনি বলে দিন এতে গুনাহ এর উৎস রয়েছে, আর মানুষের জন্যে কিছু উপকারও নিহিত আছে।" – সূরা বাকারা ঃ আয়াত ঃ ২১৯

শরাব বা মদ আঙ্গুর, খেজুর, গম, জব ইত্যাদির রস দ্বারা তৈরী করা হয়। পবিত্র কোরআনের সূরা নাহল এর ৬৭ নং আয়াতে শরাব সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এটা আকলকে বিকৃত , বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তিকে বিভ্রান্ত ও অনুভূতিকে উত্তপ্ত করে স্বাভাবিক ও সুস্থ লোককে অজ্ঞান করে দেয় এবং চিন্তা শক্তি নষ্ট করে ফেলে। মদ্য পানকারীর মধ্যে এক প্রকার উত্তেজনার আধিক্য দেখা যায়, যার ফলে আজে বাজে বকতে থাকে, যে সব কথা বলা যায় না তাও বলে ফেলে। এমতাবস্থায় সে না পারে ইজ্জত সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে আর না পারে গোপনীয়তা বজায় রাখতে। এমনকি রাষ্ট্রীয় একান্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা পর্যন্ত মাতাল অবস্থায় প্রকাশ হয়ে পড়ে।

শরাবের মাতলামীতে যেহেতু হুশ-জ্ঞান ঠিক থাকেনা, মা বোন ভাল মন্দ ইত্যাদির পার্থক্য পর্যন্ত বাকী থাকে না। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করা এবং ইবাদাতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

মদ্যপানে শুধু মানুষের হুশ জ্ঞানই বিগড়ে যায় না বরং পাকস্থলী নষ্ট হওয়ায় হজম শক্তির সর্বক্ষমতা ও নিয়ম বিগড়ে যায়। এতে পাকস্থলীর ব্যথা, পাকস্থলীতে ক্ষত বরং; এতে পাকস্থলীতে ক্যান্সারের মত মারাত্মক রোগও সৃষ্টি হয়। মদ্য পানে রক্তের তীব্রতা খুবই বেড়ে যাওয়ায় খুব শীঘ্র অসুস্থতা দেখা দেয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে মদের গরম প্রভাবে বুকের রোগে শান্তি পাওয়া যায় বটে তবে প্রকৃত পক্ষে অন্তরের অবস্থা একেবারেই বিগড়ে যায়। কারণ কেন্দ্রীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি প্রভাবিত হওয়ার ফলে প্লীহা এবং যকৃৎ – এর কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। বেশী বেশী মদ্যপান করায় প্রস্রাব বৃদ্ধি সমস্যা দেখা দেয়, এমন কি মদ্যপায়ী প্রস্রাবের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে।

এর চেয়ে বড় খারাবী এবং দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে যে, শরাব পানকারী ভাল মন্দের পার্থক্য বরং মা-বোনের চেতনা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। সে আকল বিবর্জিত এবং আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত থেকে দূরে সরে পড়ে। লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বর্তমান যুগের পশ্চিমা দেশবাসীর মত অন্ধকার যুগে আরবের অধিবাসীগণও শরাব প্রিয় ছিল। শরাব তাদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলামের দৌলত দান করতঃ অল্প দিনের মধ্যে শরাব থেকে মুক্তি দিলেন। শরাব হারাম হওয়ার বিধান সম্বলিত হুকুম আহকাম ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়। তবে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত সর্বশেষ হুকুম যখন নাজিল হয় এবং মদীনার অলি গলিতে শরাব হারাম হওয়া সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয় তখনই শরাবের পাত্র, পান পাত্র ও কলসীগুলি টুকরা টুকরা হয়ে গেল। পবিত্র মদীনার গলীতে গলীতে দুর্গন্ধযুক্ত পানির মত শরাব ঢেলে ফেলা হল। অতঃপর আর কখনই তা কারো মুখের কাছে আসে নাই।

মাটি খাওয়া এবং চলা ফেরা অবস্থায় খাওয়া

مَنْ اَكَلَ الطِّيْنَ فَكَاَنَّمَا اَعَانَ عَلٰى قَتْلِ نَفْسِهٖ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন "যে ব্যক্তি মাটি ভক্ষণ করে সে যেন নিজকে নিজে হত্যা করার জন্যে সাহায্য করে।"

– তাবরানী

মাটি গুণগত ভাবে পবিত্র এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে নাপাকী না লাগে ততক্ষণ তা পবিত্র থাকে। তবে মাটি খাওয়ার জিনিস নয়। মাটি খাওয়া অথবা মাটি মিশ্রিত কোন কিছু খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই ক্ষতিকর। এখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী পাঠকগণের সামনে তুলে ধরা হল।

মাটি হজমে সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেও হজম হতে পারে না। কেননা এটা পাকস্থলীতে স্থির থাকে এবং পেটের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْاَكْلُ فِى السُّوْقِ دَنَاءَةٌ

অর্থাৎ "বাজারে কোন কিছু খাওয়া নিকৃষ্ট কাজ।" বাজারে চলা ফেরা অবস্থায় খাওয়া ভদ্রতা ও সভ্যতার খেলাপ এবং স্বাস্থ্য রক্ষা বিধানের পরিপন্থী। চলতে ফিরতে এটা সেটা মুখে দেওয়া পশুর আচরণ, মানুষের কাজ নয়।

খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করা

اَلْوُضُوْءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِى الْفَقْرَ وَبَعْدَهٗ يَنْفِى اللَّحَمَ

"খাওয়ার পূর্বের অযূ (হাত মুখ ধৌত করা) দরিদ্রতা দূর করে এবং খাওয়ার পর (হাত মুখ) ধৌত করায় স্থূলতা দূর হয়।"

অযূর আভিধানিক অর্থ ধৌত করা ও পবিত্র করা। উলামাগণ তিন প্রকার অযূর উল্লেখ করে থাকেন।

(১) অযূয়ে সালাত বা নামাযের অযূ। এতে হাত মুখ ধৌত করা ব্যতীত মাথা মাসেহ করা ও পা ধৌত করা ফরজ। কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া সুন্নাত।

(২) অযূয়ে নাউম বা ঘুমের অযূ। এ অযূতে হাত মুখ ধৌত করতে হয় এবং ইস্তিঞ্জা করতে হয়।

(৩) অযূয়ে তায়াম বা খাওয়ার অযূ। এ অযূতে হাত ধৌত করা ও কুলি করা সুন্নাত।

হযরত সালমান ফারসী (রাযি) বর্ণনা করেন, আমি তাওরাত কিতাবে পড়েছি, খাওয়ারপূর্বে অযূ করায় বরকত নাযিল হয়। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বললেন – بركت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده "খাওয়ার পূর্বে এবং খাওয়ার পরে অযূ করলে খানায় বরকত হয়।" –সূনানে আবূ দাঊদ, তিরমিযী

আজো অধিকাংশ মানুষের সামনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী সুন্নত বিষয় অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তা হল রুমাল অথবা তোয়ালে ইত্যাদি দ্বারা হাত মোছা (শুষ্ককরা) অথবা না মোছার ব্যাপারে হুকুম কি?

মূলতঃ সুন্নত হল খাওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করার পর কোন কাপড় বা তোয়ালে দ্বারা হাত না মোছা। অবশ্য খাওয়ার পর হাত ধৌত করে অবশ্যই কোন কাপড় অথবা তোয়ালে দ্বারা হাত মোছন করা যাবে। কিন্তু আশ্চর্য! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পদ্ধতি কতই না হেকমতপুর্ণ। কারণ রুমাল হোক অথবা তোয়ালে হোক তাতে জীবানু অথবা ময়লা ইত্যাদি থাকা খুবই সম্ভব। তাই খানা খাওয়ার জন্য হাত ধৌত করার পর রুমাল তোয়ালে দ্বারা হাত মুছে ফেললে হাত ধোয়ার সমস্ত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

খাওয়ার পূর্বে দুআ পাঠ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে সকল কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা হবে তার মধ্যে বরকত হবে। সেমতে খানা শুরু করার পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত দোয়া রয়েছে। তা হলো ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও তাঁর বরকতে শুরু করছি। এতে বুঝা যায়, খানার পূর্বে তাছমিয়াহ অর্থাৎ পূর্ণ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া জরুরী নয়।

যেমন ভাবে জানোয়ার পাখী ইত্যাদি জবাই করার পূর্বে তাছমিয়ার পরিবর্তে بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ "বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার" বলা হয়। তেমনি খাওয়ার পূর্বেও এভাবে বললে চলবে।

বস্তুবাদী যে সকল লোক মাল আসবাব ও যুক্তি ব্যতীত অন্য কিছুতে বিশ্বাসী নয় তারা বলে থাকে, রুটির পরিবর্তে কয়েকটি কালিমা ও শব্দের দ্বারা পেট ভরবে কি করে? কি করে অল্প খাদ্য 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা বাড়তে বা রবকতপূর্ণ হতে পারে? এ সকল লোক এ হাকীকত ভুলে যায় যে, ক্ষুধা এবং পরিতৃপ্তির সম্পর্ক বস্তুর সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তদাপেক্ষা অধিক সম্পর্ক হল অনুভূতি ও উপলব্ধির সাথে।

কে না জানে যে, চিন্তা ও পেরেশানীর সময় ক্ষুধা থাকে না। দুঃখে কষ্টে ক্ষুধা পিপাসার প্রতি লক্ষ্য থাকে না। পক্ষান্তরে বিপদে পড়লে পিপাসার সীমা থাকে না। তাই যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির চিন্তা চেতনা মহান আল্লাহ কেন্দ্রিক হয়ে যায় এবং যার ঈমান সকল গুণের আধাঁর মহান সত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়, সে অবশ্যই সামান্য নেয়ামতকে অনেক বেশী মনে করে। বস্তুর বেশী কমের প্রতি তার ভ্রুক্ষেপ থাকে না। এ কারণে যে, তার জন্য স্বীয় প্রভুর নামই সব কিছু। সুতরাং নিজ প্রভুর স্মরণ তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সামগ্রী। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই সুখী যে তার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক-এর নামেই সকল কাজ আরম্ভ করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করে।

খানা খাওয়ার জন্য বসার পদ্ধতি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে বসে খানা খেতেন? এ প্রশ্নের জবাবের জন্যে নিম্নের হাদীসটি দেখুন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَجَلَسَ عَلٰى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ
رُبَّمَا نَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَجَلَسَ عَلَى الْيُسْرٰى

"খানা খাওয়ার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাটু গেড়ে স্বীয় কদম যুগলের পিঠের উপর বসতেন। অধিকাংশ সময় ডান পা খাড়া করে রেখে বাম পায়ের উপর বসতেন। (বর্ণনাকারী বসার উক্ত পদ্ধতি বর্ণনা করে এ কথাও বলেছেন যে, এ পদ্ধতিটি স্বীয় মহান রব্বুল আলামীনের প্রতি মনোযোগী হওয়ার বহিঃপ্রকাশ ছিল। এবং এতে খানার প্রতি আদব ও সম্মানের প্রকাশ ঘটতো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দিষ্ট বসার পদ্ধতির কথা একটু ভেবে দেখুন, তা কতইনা স্বাভাবিক ছিল এবং এভাবে বসায় কিরূপ আরামবোধ হয়। নিঃসন্দেহে মানুষ এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলেও ক্লান্তি অনুভব হবে না। কিন্তু আজ আমরা এভাবে না বসে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি এটা স্বভাবতই এক প্রকার বোঝা (ঝামেলা)। মনে হয়। যে সকল সাহেবগণ দাঁড়িয়ে অর্থাৎ BUFFET –এ খাওয়াকে সম্মান ও গৌরব মনে করে তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতেরই বিরোধিতা করছে না বরং খানাকেও অসম্মান করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার মধ্যে অযথা কষ্টও করছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার খানা টেবিলে রাখার ফলে একটা টানাটানি অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অন্যদিকে দস্তরখানার উপর বসে খানা খেতে খুবই অল্প জায়গার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া এতে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পারিক সসুম্পর্কের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা অন্য কোন পদ্ধতিতে সম্ভব নয়।

খানার মধ্যে তাড়াতাড়ি করা

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قُدِّمَ
الْعِشَاءُ فَابْدَؤُا بِهٖ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوْا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ

"হযরত আনাস (রাযি) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, খানা সামনে এলে মাগরিবের নামায আদায়ের পূর্বেই খানা খেয়ে নাও এবং খানার মধ্যে তাড়াহুড়া করো না।" –বুখারী শরীফ

রাত্রের খানাকে عَشَاءٌ আশাউন বলা হয়। অধুনা সভ্যগণ রাত্রের খানা খুবই দেরী করে খেয়ে থাকে। খানা বিলম্বে খেয়ে এবং খাওয়ার পরই ঘুমিয়ে গেলে খানা ঠিকমত হজম হয় না। হজম শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ডাক্তার ছিলেন না বটে, তবে লক্ষ্য করার বিষয় হল তাঁর কথাগুলি কতই না হেকমতপূর্ণ । তিনি বলেন দুপুরের খানা খাওয়ার পর কায়লুলাহ অর্থাৎ কিছুক্ষণ শুয়ে আরাম করবে এবং রাত্রের খানা খাওয়ার পর চল্লিশ কদম হাঁটাহাঁটি করবে।

উপরোল্লিখিত হাদীসের উদ্দেশ্য হল, ক্ষুধার সময় সকল কাজের পূর্বে খানা খাবে। যদি কখনও এমনটি ঘটে যায় যে, খানা সামনে রাখা হয়েছে আর এদিকে নামাযের আযান হয়ে গেছে তাহলে এমতাবস্থায় প্রথমে খানা খাবে অতঃপর নামায আদায় করবে।

মাগরিবের নামাযঃ যার ওয়াক্ত খুবই সংকীর্ণ সে ক্ষেত্রেও ঠিক একই হুকুম। অর্থাৎ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার ভয়ে জলদী জলদী খাবে না। বরং হাদীসে বলা হয়েছে – খানায় জলদী করো না; ধীরে ধীরে আরামের সঙ্গে খাও।

মনে রাখবে এমন ঘটনা কদাচিতই (কখনও কখনও) ঘটে থাকে। তবে এটাকে এমন অভ্যাসে পরিণত করে নিবে না যে, ঠিক নামাযের সময় খানা সামনে রাখা হবে আর নামায বাদ দিয়ে খানা খেতে বসে যাবে।

আল্লাহর নামে ডান হাত দ্বারা খানা শুরু করা

খানা-পিনার আদব সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় ছাড়াও দুটি বিষয় সর্বদা খেয়াল রাখা খুবই জরুরী ।

(১) খানা পিনা আল্লাহর নামে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা।

(২) ডান হাত দ্বারা পানাহার করা।

এ বিষয়গুলির উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে নিজের পক্ষ হতে কিছু না লিখে সরাসরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুল্যবান বাণী সমূহ উল্লেখ করার সৌভাগ্য লাভ করছি।

١- عَنْ عُمَرَو بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّ اللّٰهَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ

(১) "হযরত আ'মর ইবনে আবূ সালমা (রাযিঃ) বলেন, আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নাম লও, অর্থাৎ বিসমিল্লাহ পাঠ কর,ডান হাত দ্বারা খাও এবং নিজের সম্মুখ থেকে খাও।" –বুখারী, মুসলিম

(২) হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযি) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِاسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنْ نَسِىَ اَنْ يَّذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اَوَّلِه فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَه وَاٰخِرَه -

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন খানা খেতে শুরু করবে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে খানা আরম্ভ করবে। যদি প্রথমে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায় তবে বিসমিল্লাহি আউওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি বলবে–

–আবু দাউদ, তিরমিযী

(৩) "হযরত জাবের (রাযি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় ঘরে প্রবেশের সময় এবং খানা খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়ে তবে শয়তান তার সাথীদের বলতে থাকে, চলো! এটা তোমাদের জন্য রাত্রি কাটাবার এবং খানা খাওয়ার স্থান নয়। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি ঘরে প্রবেশের সময় এবং খানা শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ না পড়ে তবে শয়তান বলতে থাকে তোমাদের জন্য রাত্রি যাপন করার এবং খানা খাওয়ার স্থান উভয়ই মিলে গেছে।"

– মুসলিম শরীফ

(৪) হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযি) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছয়জন সাহাবী (রাযি)-এর সঙ্গে খানা খাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক এসে তাদের সঙ্গে খেতে বসে দুই লোকমাতেই সব খানা খেয়ে ফেলল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই ব্যক্তি যদি আল্লাহর নামে শুরু করত তবে তোমাদের সকলের জন্যেই এই খাদ্য যথেষ্ট হত।" – তিরমিযী শরীফ

(৫) হযরত ইবনে ওমর (রাযি) থেকে বর্ণিতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَاْكُلْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ بِشِمَالِه وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَاِنَّ الشَّيْطٰنَ يَاْكُلُ بِشِمَالِه وَيَشْرَبُ بِهَا

"তোমাদের কেউ বাম হাত দিয়ে খেও না। কেননা শয়তান বাম হাত দ্বারা পানাহার করে।" – সূনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী

খানা এবং অপব্যয়

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّه لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

"তোমরা খাও, এবং পান কর তবে অপব্যয় করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না। –সূরাহ আরাফ ঃ আয়াত ঃ ৩১

পানাহার সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের উক্ত মহামূল্যবান নীতি গ্রহণ করে নেওয়ার পর হজম শক্তির গন্ডগোল এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ইসরাফ (اسراف) শব্দটি সাধারনণত অপব্যয় ও অতিরিক্ত খরচ অর্থে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ সীমাতিরিক্ত খরচ।

কিন্তু খানা-পিনার ক্ষেত্রে অনর্থক খরচ অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়াকেই ইসরাফ বুঝায় না বরং খানা-পিনার মধ্যে দুই প্রকার ইসরাফ রয়েছে যা থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরী।

(১) কামমিয়াত বা পানাহারের পরিমাণের মধ্যে ইসরাফ বা অপব্যয় করা। (২) কাইফিয়াত বা খানার কোয়ালিটি ও গুণের মধ্যে ইসরাফ করা।

কামমিয়াত বুঝবার জন্য অন্য একটি সহজ শব্দ 'পরিমাণ' মাত্রা বা সংখ্যা ইত্যাদি বলা যায়। অর্থাৎ এত পরিমাণ আহার করা যে, সহজে হজম করতে সক্ষম না হয়, যার ফলে মারাত্মক অসুখে পতিত হতে হয়। নিয়মিত বদহজমী শুরু হয়, ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্যা এবং চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়। অনুভূতি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, পাকস্থলী নিজ কর্মে অক্ষম হয়ে পড়ে। ঘুম বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু হয়। শরীর মোটা হওয়াটাও সাধারণত খানা-পিনার মধ্যে ইসরাফ করার ফল।

খানার কাইফিয়াত অর্থাৎ Quality গুণ বা অবস্থার মধ্যে ইসরাফ হল ঐ সকল জিনিস পানাহার করা যা তার দৈহিক চাহিদা স্বভাব ও মেজাজের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অথবা মওসুম বা ঋতু হিসাবে উপযোগী না হওয়া। যেমন শীতকালে ঠান্ডা জাতীয় খাবার বা জ্বরের অবস্থায় জ্বরের অনুপযোগী বা প্রতিকুল গরম কিছু গ্রহণ করা। আল্লাহর কালাম যেহেতু চিরন্তন শ্বাশত ও সমগ্রবিশ্ববাসীর জন্যেই প্রযোজ্য সেহেতু তার স্বর্ণোজ্জ্বল নিয়ম পদ্ধতিও চিরন্তন শ্বাশত এবং সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণকর।

কিছুদিন পূর্বে "লুইংগ কারনারো" (Luigi cornoro) নামে ইটালির এক লেখক এ বিষয়ের মূলনীতি সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটি সকল মহলেই সমাদৃত ও গ্রহনীয় হয়েছে। ইংরেজী এবং ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় এই গ্রন্থ অনুদিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমরা যদি খানা পিনার ক্ষেত্রে ইসরাফে লিপ্ত থাকি তাহলে আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে?

এবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীসমূহ লক্ষ্য করুন ঃ

(১) "মুসলমান এক নাড়ি দ্বারা খায় আর কাফের ও মোনাফেক সাত নাড়ি দ্বারা খেয়ে থাকে। – বুখারী শরীফ

(২) "ক্ষুধার অতিরিক্ত ভক্ষণকারীকে খুবই ঘৃণার চোখে দেখা হয়।"

– মুসনাদে দাইলামী

(৩) " যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অত্যধিক খাবে কিয়ামত দিবসে সে ঐ পরিমাণ ক্ষুধার্থ থাকবে।" – ইবনে মাজাহ

বেশী খাওয়ার ক্ষতি সমূহ

تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الرَّغْبِ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

"বেশী খাওয়া থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও।" (الكامل لابن عدى) খানা এবং ইসরাফ অধ্যায়ে আমরা খানা পিনার মধ্যম পন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে খানা-পিনার মধ্যে অতিরিক্ত আহারের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরছি।

(১) **ডায়েবেটিসঃ** অধিক ভোজনের প্রাথমিক ফল হল ডায়াবেটিস। কেননা বেশী খাওয়ার কারণে লালাগ্রন্থীকে বেশী কাজ করতে হয়। এ কারণে অভ্যন্তরীণ আদ্রতা (রস বা insulin অর্থাৎ বহুমূত্র রোগের প্রতিষেধক) কমে যায় এবং রক্তে চিনির (Sugar) পরিমাণ বেড়ে যায়।

(২) **ব্লাড প্রেসার ঃ** অধিক ভোজন রক্তের চাপ বৃদ্ধির একটা অত্যাবশ্যকীয় দ্বিতীয় কারণ। কেননা ডায়াবেটিস এবং ব্লাড প্রেসার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

(৩) **ফালেজ বা প্যারালাইসিস ঃ** প্যারালাইসিসও অধিক ভোজনের কারণে হয়ে থাকে। এতে রক্তবাহী শিরাগুলি সংকীর্ণ হয়ে যায়, ফলে রক্ত চলাচল বাঁধা প্রাপ্ত হয়। এভাবে যখন শিরাগুলি একেবারেই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখন সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুভূতিহীন হয়ে যায়। আর এ অবস্থাটি মস্তিষ্কের কোন অংশে হঠাৎ প্রকাশ পেলে মানুষ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়।

(৪) **হৃদ রোগঃ** শিরার সংকীর্ণতা হৃদ রোগের অন্যতম কারণ। কেননা শিরার চূড়ান্ত সংকীর্ণতা হৃদপিন্ডের সংগে সম্পর্কযুক্ত হয়। এমতাবস্থায় হৃদপিন্ডের বিবর্তন হওয়া এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

(৫) **অসময়ে বার্ধক্যে পতিত হওয়া ঃ** অধিক ভোজনের ফলেই এ অবস্থা হয়ে থাকে। কেননা বেশী খেলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি যথাযথভাবে কাজ করতে অপরাগ হয়ে পড়ে। ফলে মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই দুর্বল বা শক্তিহীন হয়ে যায় এবং তাকে বৃদ্ধ মনে হতে থাকে।

(৬) **শরীর মোটা বা স্থুল হওয়াঃ** এটাও অধিক ভোজনের কারণে হয় এবং এই অবস্থায় আরো বহু রোগের কারণ হয়। যেমন শরীরের জোড়ার রোগ ও অস্থিমজ্জার ব্যথা ইত্যাদি।

(৭) অজীর্ণ গ্যাস্টিক এবং অতিসার তথা ধ্বংসাত্মক ব্যাথাও অধিক ভোজনের ফল। এতে মানুষ পায়খানা ও প্রস্রাবের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এভাবে ভাল মানুষও (অনেক সময়) পাগল উন্মাদ পর্যন্ত হয়ে যায়।

মোটকথা অধিক ভোজ হাজরো সমস্যা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে যদি কেউ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের উপর আমল করে, সময় মত এবং জরুরত পরিমাণ খানা খায় তবে সর্বদাই সুস্থ শরীরে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। এ সম্পর্কে নিম্নের বাণীটি লক্ষ্য করুন ঃ

"মানুষের জন্য কোমর সোজা রাখার মত কয়েক লোকমা (সামান্য) খানাই যথেষ্ট। আর যদি একান্তই বেশী খাওয়ার আবশ্যক হয়ে পড়ে তবে পেটের এক তৃতীয়াংশ খানা, এক তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করবে এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্যে খালি রাখবে।"

অল্প অল্প খাওয়া

"হযরত জাবালা ইবনে সুহাইম (রাযি) বর্ণনা করেন, তখন ছিল দুর্ভিক্ষের বছর। আমরা ইবনে যুবায়ের (রাযি)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদেরকে খাওয়ার জন্যে খেজুর দেওয়া হতো। একদিন আমরা যখন খানা খাচ্ছিলাম তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) আমাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ

لَا تُقَارِنُوا فَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْقِرَانِ

"তোমরা (দুইটি খেজুর) একত্রে মিলিয়ে খেয়ো না, কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে একত্রে খেতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন তবে তার ভাই (যার সঙ্গে সে একত্রে খাচ্ছে) অনুমতি দিলে এর ব্যতিক্রম করে খেতে পারবে। – বুখারী মুসলিম শরীফ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রাযি) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব বড় একটা পিয়ালা ছিল যার নাম ছিল "গার্‌রা"(غُرَّاء) এটাকে চার জনে উঁচু করতে হত। (সম্ভবতঃ এটা ডেক জাতীয় বর্তন হবে। চাশ্তের নামায শেষ করে সকলে মিলে এটা নিয়ে যেতেন। অতঃপর এর মধ্যে সারীদ (এক প্রকার সুস্বাদু খানা) পাকান হত। সাহাবীদের (রাযি) সংখ্যা যখন বেশী হত তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাটুতে ভর করে বসে যেতেন। একদা এক গ্রাম্য লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে বসা দেখে বলল, এটা কেমন বসা ? লোকটির কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِىْ كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا عَنِيْدًا - ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُوْا مِنْ حَوَالِيْهَا وَدَعُوْا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيْهَا

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমাকে উদার, দয়াশীল করে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে অবাধ্য হঠকারী ও উদ্ধত করেন নাই। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বর্তনের একপার্শ্ব হতে খাও এবং উপরের অংশ বাদ রাখ। (কারণ) আল্লাহ এটা থেকে তোমাদের জন্য বরকত নাযিল করবেন।" – আবূ দাউদ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি) থেকে বর্ণিত ঃ

اَلْبَرَكَةُ تَنْزِلُ فِىْ وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوْا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ

"খানার মধ্যখানে বরকত নাযিল হয়। তোমরা খানার কিনারা থেকে খাও এবং মধ্যখান থেকে খেয়ো না।" – তিরমিযী শরীফ

খানার মধ্যে ফুঁক দিও না

لَا يُنْفَخُ فِى الطَّعَامِ الْحَارِّ فَهُوَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, গরম খানার মধ্যে ফুঁক দিও না। কেননা এটা করতে নিষেধ করা হয়েছে।"

–মুসনাদে ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ

আল্লাহ! আল্লাহ! খানার মধ্যে ফুঁক না দেওয়ার উপদেশ কতই না হেকমতপূর্ণ শিক্ষা। কারণ দাঁতের মধ্যে যে সকল অসুখ হয়ে থাকে তার কোন কোনটি সংক্রামক ব্যাধি অর্থাৎ একজন থেকে অন্যের দেহে ছড়ায়) কারো কারো মুখ থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হয়। এমতাবস্থায় প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, খানার মধ্যে ফুঁক দেওয়া অন্যের জন্য কতটুকু কষ্টের কারণ হয় এবং স্বয়ং ভক্ষণকারীর জন্যই বা কতটুকু ক্ষতিকর। এটা হল গরম খাদ্যে ফুঁক দেওয়ার কথা। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বেশী গরম খানা পছন্দই করতেন না। তিনি বলতেন, এর মধ্যে বরকত হবে না। এটা সতঃসিদ্ধ কথা যে, আপনি পরীক্ষামূলকভাবে রুটির তাওয়া থেকে গরম গরম রুটি তুলে তুলে খাওয়া শুরু করুন এবং লক্ষ্য করে দেখুন সাধারণ খানার চেয়ে অধিক খেতে পারেন কি না এবং খাওয়ার সময় রুটির পরিমাণ সম্পর্কিত বোধুটুকুও থাকে কি না।"
–মুসতাদরাকে, হাকিম, মুজামে তাবরানী

গরম খানা ভক্ষণে গালের ছাল উঠে যায় এবং পরিপাক তন্ত্রের সুস্থতা (অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্যক্ষমতার উপর প্রভাব পড়ে। গরম গরম খানার মধ্যে ঠান্ডা পানি

পান করাতো (আর এর প্রচলন এখন খুবই ব্যাপক) দাঁতের সঙ্গে বড় জুলুম করার শামিল। বিশেষ করে গরমকালে বরফের ঠান্ডা পানি পানকারীর জন্য গরম খানা খাওয়া খুবই ক্ষতিকর। সুতরাং ধীরস্থির ভাবে এতমিনানের সঙ্গে খানা খাওয়া উচিত, যাতে ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করার প্রয়োজন না হয় বা দাঁত ও পরিপাকের জন্য ক্ষতিকর না হয়।

পড়ে যাওয়া লোকমা

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَاخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى وَلْيَاْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ -

"হযরত জাবের (রাযি) থেকে বর্ণিত ঃ তোমাদের মধ্যে কারো লোকমাহ পড়ে গেলে তা তুলে নাও এবং মাটি ইত্যাদি পরিষ্কার করে খেয়ে ফেল এবং শয়তানের জন্য এটা রেখে দিও না।" – মুসলিম শরীফ

এ বিষয়ে অন্য এক হাদীসের বর্ণিত বাক্য হল; সর্বাবস্থায়ই শয়তান তোমাদের নিকট এসে থাকে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কারো কোন লোকমা পড়ে গেলে তা থেকে মাটি ইত্যাদি পরিষ্কার করে খেয়ে নাও; শয়তানের জন্য এটা রেখে দিওনা।"

আমাদের এযুগে পাকী নাপাকীর অনুভূতিই তো প্রায় উঠে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা এবং ইস্তিঞ্জার এহতেমাম না করা একটা ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে হাত থেকে কোন খাদ্য দ্রব্য পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খাওয়া খারাপ মনে করা হচ্ছে। মনে করা হয় এটা নাপাক হয়ে গেছে, চাই সেটা শুকনা কোন খাবার হোক না কেন। আসল কথা হল রিযিকের গুরুত্ব এবং নেয়ামতের কদর সম্পর্কিত অনুভূতি অন্তর থেকে মুছে গেছে তাই বরকতও উঠে গেছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "হাতের লোকমা পড়ে গেলে তা পরিষ্কার করে খেয়ে নাও। তুমি না খেলে এটা শয়তানের লোকমায় পরিণত হবে এবং তোমাদের খাদ্য শয়তানের কাজে আসবে।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই তালীমের প্রতিক্রিয়া এমন হয়েছিল যে, আমাদের বুযুর্গগণ খাদ্যের কণা এবং লবনের দানা পর্যন্ত যত্নের সঙ্গে ভক্তি সহকারে চেটে খেয়ে নিতেন।

পতিত খানা

পড়ে যাওয়া খানা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ

مَنْ اَكَلَ مَا سَقَطَ مِنَ الْمَائِدَةِ عَاشَ فِىْ سَعَةٍ وَ عُوْفِىَ فِىْ وَلَدِهٖ

"যে ব্যক্তি দস্তরখানা থেকে পড়ে যাওয়া খানা উঠিয়ে খেয়ে নিল তার দস্তরখানা প্রশস্থ হয়ে গেল অর্থাৎ তার রিযিকের মধ্যে বরকত এসে গেল এবং তার সন্তান-সন্ততি সুস্থতা ও নিরাপত্তা পেয়ে গেল।"

এ সম্পর্কে অন্য একটি হাদীস হলো ঃ

اٰمَنَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَصَرَفَ عَنْ وَّلَدِهِ الْحُمْقَ

"সে দারিদ্র এবং মুখাপেক্ষিতা হতে নিরাপদ হয়ে গেল। ধবল ও কুষ্ঠরোগ থেকে রক্ষা পেল এবং তার সন্তানাদি থেকে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি দূর হয়ে গেল।"

এ সম্পর্কিত তৃতীয় হাদীসের বর্ণনা ঃ

اُعْطِىَ سَعَةً مِّنَ الرِّزْقِ

"তার রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা (স্বচ্ছলতা ও বরকত) দান করা হয়।"

হযরত জাবের (রাযি) থেকে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَاْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى وَلْيَاْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ -

"তোমাদের কারো কোন লোকমা পড়ে গেলে তা তুলে নাও (অতঃপর) এর উপর যে সকল ময়লা লেগে গেছে তা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেল এবং শয়তানের জন্য এটা ছেড়ে দিও না।" – মুসলিম শরীফ

আমাদের নিজেদের মনগড়া অথবা পাশ্চাত্য থেকে ধার করা সভ্যতানুযায়ী পতিত খাদ্যদ্রব্য উঠিয়ে খাওয়া আদব (ATICATE বা ভদ্রতা) এর পরিপন্থী মনে করা হয়। আমাদের বুঝেই আসে না যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোল্লেখিত ইরশাদ বর্তমান থাকা সত্বেও আমাদের স্বেচ্ছাচারিতার কি অধিকার থাকতে পারে।

পতিত খানার বরকত সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত ফরমান একবার আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত। পতিত খানা উঠিয়ে খাওয়ার বরকত ও উপকারিতা–

১। খানা এবং রিজিকের মধ্যে বরকত ও প্রশস্ততা আনে।
২। সন্তানাদির সুস্থতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
৩। অভাব-অনটন ও ভিক্ষাবৃত্তি ও অনাহার থেকে নিরাপদ রাখে।
৪। কুষ্ঠ রোগের মত ব্যাধি থেকে রক্ষা করে।
৫। সন্তান সন্ততি নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী হতে রেহাই পায়।
৬। স্বীয় খানা শয়তানের খাদ্য হয় না।

আমাদের উচিত পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোবলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে জলাঞ্জলী না দিয়ে পতিত খানা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করতঃ ভক্তি সহকারে বিনা দ্বিধায় খেয়ে নেওয়া। এতেই মঙ্গল ও বরকত রয়েছে।

টেক লাগিয়ে খেয়ো না

كَانَ يَقُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اٰكُلُ مُتَّكِاً

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তাকিয়া বা টেক লাগিয়ে খাই না।" এ বিষয়ে হযরত আলী ইবনে আকমর (রযিঃ)-এর বর্ণিত অন্য এক হাদীস হলঃ

اَمَّا اَنَا فَلَا اٰكُلُ مُتَّكِئًا

"যথা সম্ভব আমি টেক লাগিয়ে খাই না।" –বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টেক দিয়ে খাওয়া কেন পছন্দ করতেন না? এ প্রশ্নের জবাব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রা সহধর্মিনী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর মোবারক জুবানেই শুনুন। তিনি বলেন। আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম (আমার জীবন আপনার উপর কুরবান হোক) "আপনি তাকিয়া লাগিয়ে আহার করুন" একথা শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা মোবারক জমিনের দিকে ঝুকিয়ে বললেন,

اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ اَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ وَاٰكُلُ كَمَا يَاْكُلُ الْعَبْدُ

"আমি আল্লাহর একজন গোলাম মাত্র। তাই এই ভাবে আমার বসা শোভা পায় যেভাবে একজন গোলাম (মনিবের সামনে) বসে। আর এমন ভাবেই আমার খানা খাওয়া উচিত যেমনভাবে একজন গোলামের তার মনিবের সামনে খাওয়া শোভা পায়। –আহকামুন নবুওয়াত

চিন্তার বিষয়, এ বিনয় ও নম্রতা এবং বন্দেগী ও দাসত্বের প্রকাশ এমন ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পেয়েছে যিনি বিশ্ব জাহানের সর্দার, সৃষ্টির মূল, যার কারণেই বিশ্ব জাহান অস্তিত্ব লাভ করেছে, যার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে আমাদের অবস্থা হলো আমরা সর্বক্ষণই উদ্ধত ও বাবুয়ানায় লিপ্ত থাকি। অসুস্থতা অথবা কোন অপারগতার কারণে কখনো টেক লাগিয়ে খাওয়া দাওয়া করলে তো কোন কথা নাই। তবে একজন সুস্থ সবল ও সামর্থবান লোকের জন্য কখনোই এভাবে খাওয়ার অনুমতি নাই। আল্লাহর কোন বান্দা তার দেওয়া নেয়ামত খাবে আর বাঁকা হয়ে বাবুয়ানা কায়দায় বসবে এটা তার দাসত্বের পরিপন্থী।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মিলিত খানা

সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আনাস (রাযি) বর্ণনা করেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَاْكُلُ وَحْدَهٗ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী খানা খেতেন না।" এটা শুধু মাত্র একজন সাহাবীর (রাযি) বর্ণনা নয়, বহুসংখ্যক সাহাবাদের বর্ণনা এবং তাদের নিজেদের সম্মিলিত খাওয়ার আমলই এ বিষয়ে স্বাক্ষ্য বহন করে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথকভাবে খানা খেতেন না বরং মজলিসে উপস্থিত ছোট বড় সকল পর্যায়ের লোকদের নিয়ে খানা খেতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মাত্র মজলিসের সকল ব্যক্তিদের খানায় শরীক করতেন না। বরং আমীর, গরীব, ছোট বড় ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য না করেই সাথীদেরকে নিজ বর্তনের খানায় শারীক করতেন। উপস্থিত সকলকেই একই দস্তরখানায় বসাতেন এবং একই বর্তনে, একই স্থানে বসিয়ে খাওয়াতেন।

হযরত জাবের (রাযি) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "একজনের খানা দু'জনের এবং দু'জনের খানা চারজনের ও চারজনের খানা আটজনের জন্য যথেষ্ট হয়।" –মুসলিম

আধুনিক সভ্যতা মানুষকে অনেক কিছুই দিয়েছে। নবনব আবিষ্কার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা দূরকে করেছে নিকট; প্রচার মাধ্যমের যন্ত্রগুলি সমগ্র দুনিয়াকে করেছে একাকার। কিন্তু মানুষকে ভদ্রতা এবং মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। মানুষের পরস্পরে একের থেকে অপরকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। একত্রে দস্তরখানার উপর খানা খাওয়ার মানসকিতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেকে ব্যক্তিগত প্লেট ও গ্লাস ব্যবহার করছে। ফলে একত্রে খাওয়ায় যে ভালবাসা হৃদ্যতা ও মহব্বত সৃষ্টি হত তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আসুন! আমরা আবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে জীবন্ত করি।

একত্রে খাওয়ার আদব

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُوْمُ رَجُلٌ حَتّٰى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ ذٰلِكَ يُخْجِلُ جَلِيْسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسٰى أَنْ يَكُوْنَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দস্তরখানা বিছাবার পর অর্থাৎ কোন মজলিসে একত্রে খাওয়া শুরু করার সময় ততক্ষণ পর্যন্ত উঠবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দস্তরখানা উঠিয়ে নেওয়া না হয় অর্থাৎ সকলের খাওয়া শেষ না হয় এবং কোন ব্যক্তি খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেলেও সকল লোক ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত খানা থেকে হাত উঠাবে না। তবে একান্ত অপারগ হলে অপরাগতা পেশ করবে। নতুবা বৈঠকের সাথীদের লজ্জা করবে এবং তারা খানা বন্ধ করে দিবে। অথচ হতে পারে তাদের খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।" –ইবনে মাজাহ

স্বয়ং বিশ্ব জাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ اٰخِرَهُمْ أَكْلًا

"নবী করীম (সাঃ) যখন অন্যান্যদের সঙ্গে খানা খেতেন তখন সকলের শেষে খানা শেষ করতেন।"– মিশকাত শরীফ

উক্ত হাদীস দ্বারা আমরা নিম্নোক্ত মুলনীতিগুলির শিক্ষা পাই।

১। দস্তরখানায় খাওয়ার পর খানা রেখে দস্তরখানা থেকে উঠবে না।

২। সকলে খানা থেকে ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত খানা খাওয়া বন্ধ করবে না। কারণ, হতে পারে অন্যের পেটে এখনও ক্ষুধা রয়েছে। তাই তোমরা খাওয়া বন্ধ করে দিলে সেও খানা থেকে হাত তুলে নিয়ে ক্ষুধার্থ থেকে যাবে।

৩। যদি তোমার কোন অসুবিধা থাকে তাহলে অপারগতা পেশ করবে।

একত্রে খাওয়ার বরকত

পূর্ব অধ্যায়ে একত্রে খাওয়া সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ জেনেছেন। এখন সাহাবায়ে কেরামদের (রাযিঃ) আমল সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং তাদের ইসলামী সভ্যতা ও আদর্শের বরকত সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন।

كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَقُوْلُوْنَ الْإِجْتِمَاعُ عَلَى الطَّعَامِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

"হযরত সাহাবায়ে কেরামগণ বলতেন, একত্রে খানা খাওয়া মহৎ চরিত্রের পরিচায়ক।"

হযরত ওয়াহশী ইবনে হরব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা পানাহার করি কিন্তু তৃপ্ত হই না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথক ভাবে খাও? তাঁরা বললেন, জি হ্যাঁ। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

اِجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ

"তোমরা একত্রে খানা খাও। এতে তোমাদের খানায় বরকত হবে।" এ বরকতের বাহ্যিক প্রকাশ ও বাস্তব প্রমাণ হলো সর্বদা দুইজন পৃথক পৃথক ব্যক্তির খানা একত্রে তিন জনের এবং তিনজনের খানা চার জনের জন্য যথেষ্ট হয় এবং কেউই ক্ষুধার্থ থাকে না। আর এর বিপরীত এই লোকগুলি যদি উক্ত খানাই পৃথক পৃথক ভাবে খায় তবে কারো কারো হয় তো পেট ভরে যাবে বরং এমনও হতে পারে যে দু'চার লোকমা অবশিষ্টও থেকে যেতে পারে। যা কারো উপকারে আসবে না। আবার কেউ হয়তো বা ক্ষুধার্থও থেকে যেতে পারে। কারণ প্রত্যেকের খোরাক ও অবস্থা এক রকম নয়। এটা হলো খায়ের বরকতের বস্তুগত দিক। আর রূহানী ফায়দার তো কোন পরিসীমাই নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

خَيْرُ الطَّعَامِ مَا كَثُرَتِ الْأَيْدِيْ

"উত্তম খানা হল যার মধ্যে অধিক হাত (বেশী লোক) শরীক হয়।"

উপুড় হয়ে শুয়ে খেয়োনা

হযরত সালেম যুহরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন,

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّاكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلٰى وَجْهِهِ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন যে, কেউ যেন উপুড় হয়ে শুয়ে না খায়।"

বাহ্যতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত বাণীর সঙ্গে দ্বীনী আকিদা, ইসলামী নীতিমালা এবং ধর্মীয় বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই বরং এটা

একটা খালেস চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপার এবং শারিরীক সুস্থতার খাতিরে উক্ত নির্দেশ মেনে চলা নেহায়েত জরুরী। উপুড় হয়ে শুয়ে খাওয়া শুধু স্বাস্থ্যগত ও ভদ্রতার পরিপন্থী নয় বরং এটা পশুর স্বভাবও বটে। তাছাড়া এটা হজমশক্তি ও পরিপাক প্রক্রিয়ার জন্য অশেষ ক্ষতিকর। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী ও শারীরিক তালীমের পরিপন্থী তো বটেই, কারন চিকিৎসা শাস্ত্রও তাঁর তালীমের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলাম শুধু মাত্র কতিপয় আকীদা বিশ্বাসের নাম নয় এবং ইসলামী শিক্ষা শুধু কিছু মাযহাবী ইবাদত ও প্রকাশ্য রীতিনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং ইসলামী শিক্ষা পুরা মানবীয় যিন্দেগীর অন্তর্ভুক্ত। আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন্দেগীর প্রতিটি ক্ষেত্রেই পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অসভ্য, বর্বর এবং মুর্খ জাতির মধ্যে প্রেরিত হন এবং নিজেও উম্মি (অক্ষর জ্ঞান শূন্য) ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর তা'আলার ওহীর মাধ্যমে তিনি দুনিয়াবী ইলম ও কৌশল ইত্যাদি এ পরিমাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন যা বড় বড় পন্ডিত বুদ্ধিমান ও দার্শনিকগণ অর্জন করতে সক্ষম হয় নাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদাংক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

রুটি দ্বারা আঙ্গুল পরিষ্কার করা

রিযিক আল্লাহ তা'আলার এক বড় নিয়ামত। আর নিয়ামত যত বড় হয় তার আদব-সম্মান করাও ততবেশী আবশ্যক হয়ে পড়ে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ করেন ঃ

اَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْزَلَهُ مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْخُبْزِ

"রুটির আদব ও সম্মান কর। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা এটাকে বরকতের আকাশ হতে পাঠিয়েছেন এবং তোমরা রুটি দ্বারা স্বীয় হাত পরিষ্কার করো না।" স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার পর তিনবার আঙ্গুল চাটতেন।" –মুসতাদরাক

হযরত আনাস (রাযি) এ বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য এক ইরশাদ বর্ণনা করেন ঃ

لَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لَا يَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامٍ الْبَرَكَةُ

"কোন ব্যক্তি তার আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার না করা পর্যন্ত রুমাল দ্বারা স্বীয় হাত ছাফ করবে না। কারণ কোন্ খানার মধ্যে কি বরকত আছে তার জানা নাই।"

এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ اَصَابِعَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا

"তোমাদের মধ্যে কেউ খানা খেলে ঐ সময় পর্যন্ত তার আঙ্গুল মুছবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে তা চেটে না নেয় অথবা কারো দ্বারা চাটায়।"

– বুখারী, মুসলিম

উক্ত হাদীসসমূহে যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা হল– খানার সম্মান, বিশেষ করে রুটির সম্মান করা। মূলতঃ রিযিক আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ামতসমূহের একটা বড় নিয়ামত। তাই এর ইজ্জত-সম্মান করা সর্ব বিবেচনায়ই ওয়াজিব। রুটি দ্বারা হাত-মুছা (পরিষ্কার করা) রুটিকে অবজ্ঞা করার শামিল। কারণ রুটি তো খাওয়ার জন্য, হাত পরিষ্কার করার জন্য নয়।

আঙ্গুল চাটা

(১) عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْعَقُ اَصَابِعَهُ ثَلٰثًا

১। "কাব ইব্‌নে মালেক (রাযিঃ) এর ছেলে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার আঙ্গুল চাটতেন।"

(২) عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلٰثَ

২। "হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা শেষ করে তিনটি আঙ্গুল চাটতেন।"

৩। "কা'ব ইব্‌নে মালেক (রাযিঃ) এর ছেলে তার পিতা থেকে এভাবেও বর্ণনা করেন যে, "হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তিন আঙ্গুল দ্বারা খানা খেতেন এবং খানা খাওয়ার পর আঙ্গুলগুলি চাটিয়ে নিতেন।"

(এই হাদীস তিনটি শামায়েলে তিরমিযী থেকে নেয়া হয়েছে।)

উপরোক্ত হাদীস সমূহের মাধ্যমে আমরা দুটি বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারি ঃ

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আঙ্গুল দ্বারা খানা খেতেন। সম্পূর্ণ হাতে তরকারী লাগাতেন না। কেননা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল। (২) খাওয়ার পর কাপড়

দ্বারা হাত পরিষ্কার করা এবং পানি দ্বারা হাত ধৌত করার পূর্বে তাঁর আঙ্গুল মোবারক চেটে নিতেন। আঙ্গুল চাটা মানুষের জন্মগত অভ্যাস। তাই প্রত্যেক শিশুই প্রকৃতিগতভাবে তাদের আঙ্গুল চেটে থাকে। ডাক্তারী মতে এ কাজটি পরিপাকের জন্য অত্যন্ত জরুরী। দুর্ভাগ্য যে, আধুনিক সভ্যতার দৃষ্টিতে আঙ্গুল চাটা এমনকি হাত দ্বারা খাওয়া পর্যন্ত নীচুতা অভদ্রতা মনে করা হয়। কিন্তু আমাদের এত কি দায় পড়ল যে, নিজেদের সুন্দর পদ্ধতি ও উত্তম আদর্শ ছেড়ে দিয়ে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করতে হবে?

পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় খানা

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعِيْبُ مَا كُوْلًا كَانَ اِذَا اَعْجَبَهُ اَكَلَهُ وَاِلَّا تَرَكَهُ

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন যে, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানার দোষ বের করতেন না। খানা পছন্দ হলে খেয়ে নিতেন অন্যথায় চুপ থাকতেন।"

প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সব জিনিস একই রকম প্রিয় নয়। কোন এক ব্যক্তির যে প্রকার খানা পছন্দ অন্যের তা পছন্দ নয়, এটা একটা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তবে এ কথাটি স্মরণ রাখা উচিত যে, রিযিক আল্লাহর একটা নিয়ামত। এতে দোষ-ত্রুটি বের করা রিযিকের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের নামান্তর। সর্বোপরি এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের বিরোধিতা ও আল্লাহপাকের নাশুকরিয়া করা হয়। তাই আদৌ আমাদের এরূপ করা উচিত নয়।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই কোন খানায় দোষ ধরেন নাই। মনে চাইলে খেতেন আর মনে না চাইলে রেখে দিতেন। –বুখারী, মুসলিম

এ সম্পর্কে এক বুযুর্গের ঘটনা পাঠ করুন, তাহলো এক বুযুর্গের ইন্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন? তিনি জবাবে বললেন, হিসাব নিকাশের সমস্যা সহজেই মিটে গেছে। প্রশ্নকারী (আবার) বললেন, কোন্ নেক কাজটি কাজে এসেছে? বুযুর্গ জবাবে বললেন, আমার স্ত্রী একদিন খিচুড়ী পাকাতে গিয়ে ভুলে অতিরিক্ত লবন দিয়ে ফেলে। আমি খিচুড়ীর লোকমা মুখে দিতেই মনে হল মুখে যেন বিষ পুরে দিয়েছি। তখন অনিচ্ছায় মুখ থেকে ফেলে দিতে ইচ্ছা করল। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হলো এটা তো আল্লাহর

নিয়ামত। বিবির সামনে অসন্তোষের একটা শব্দও উচ্চারণ না করে উক্ত খিচুড়ি পেট ভরে খেয়ে নেই। এই আমলটি আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হয়ে যায় এবং ক্ষমার নির্দেশ মিলে।

দুই বা ততোধিক খানার মধ্যে বাছাই

দোজাহানের সর্দার আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্রতা ও অনাহারে জীবন যাপন করেছেন তা সকলেই অবগত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী তাঁর পবিত্র হায়াতে এমন সুযোগ কখনো আসে নাই যে, সপ্তাহের সাতদিন চুলা জ্বলেছে। এ কথা স্পষ্ট যে, এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তর খানায় খুব কমই একাধিক খানা এসে থাকবে। আমরা নালায়েক উম্মত একমাত্র তাঁর উসিলাতেই আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করছি। অথচ শুকরিয়ার শব্দটিও মুখে উচ্চারণ করি না।

দস্তরখানায় একাধিক খাদ্য আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তা তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর ভাষায় শুনন।

তিনি বলেন,

مَاخَيَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ شَيْئَيْنِ اِلَّا اِخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا

নবী করীমসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখস্থ খানার মধ্যে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে এই নীতি ছিল যে, খানার মধ্যে যা অধিক সহজ ও সাধারণ হত সেটাই বেঁচে নিতেন।" –বুখারী ও মুসলিম শরীফ

এটা শুধু খানার ক্ষেত্রেই নয় বরং সকল ক্ষেত্রেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজ সরল পদ্ধতি পছন্দ করতেন, কঠিন বিষয় কখনও গ্রহণ করতেন না। একটা প্রশস্ত দস্তরখানার উপর অনেক খানা থাকা অবস্থায় আমাদের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হল ঃ

كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ

"তোমাদের নিকট থেকে খানা খাও।" লম্বা লম্বা হাত মারা এবং অন্যের সম্মুখ থেকে উঠিয়ে খাওয়া ইসলামী আদব ও শিষ্টাচারের খেলাপ। সর্বদাই নিজের সম্মুখস্থ বর্তন থেকে খাওয়া উচিত।

খানা বন্টনের পদ্ধতি

اَلاَيمَنُ فَالاَيمَنُ

"যে ব্যক্তি ডান দিকে রয়েছে তার হক বেশী।"

একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের এমন একটি মজলিসে তাশরিফ রাখেন যে মজলিসে সাহাবীগণের বসার তরতীব ছিল এরূপ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাম দিকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি)-এবং তাঁর ডান দিকে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি ছিল এবং তার সঙ্গে হয়রত ওমর ফারুক (রাযিঃ) বসে ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে দুধ পাঠালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পান করে স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী মজলিসের সাহাবীদের পালাক্রমে দিতে ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ) আরয করলেন, প্রথমে আবূ বকর (রাযিঃ)কে দিন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান দিকে বসা গ্রাম্য লোকটিকে দিলেন (যার সঙ্গে হযরত ওমর (রাযিঃ) উপবিষ্ট ছিলেন।

এবং ইরশাদ করলেন اَلاَيمَنُ فَالاَيمَنُ

"যে ব্যক্তি ডান দিকে আছে, তার হক (অধিকার) বেশী।"

হযরত সাহল ইবনে সাআদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু পানীয় নিয়ে এলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পান করলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান দিকে একটা ছেলে এবং বাম দিকে এক বৃদ্ধ বসা ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি কি এই বৃদ্ধকে আগে পান করাবার অনুমতি দিবে? ছেলেটি জবাবে বলল, কখনও নয়। যে অংশটুকু আপনার থেকে আমি লাভ করতে যাচ্ছি তাতে কাউকেই প্রাধান্য দিব না। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি ছেলেটির হাতের উপর রেখে দিলেন।" – বুখারী, মুসলিম

এ বর্ণনা থেকেই সম্মিলিত ইসলামী পানাহারের এ পদ্ধতি নির্ধারিত হয় যে, খানা-পিনা অথবা অন্য কোন জিনিস বন্টন করতে হলে ডান দিক থেকে বন্টন শুরু করবে। আর সর্বসম্মত অভিমত হলো ডান দিকে ছোট বা বড় যেমন লোকই থাকুক না কেন সকল অবস্থাতেই এই একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

অপরকে খাওয়ানো

(মেহনমানদারী করা)

خَيرُكُم مَن اَطعَمَ الطَّعَامَ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে অপরকে খানা খাওয়ায়।" –মুসতাদরাকে হাকেম

এর বিপরীত যে ব্যক্তি গরীব মিসকিনদের খানার ব্যবস্থা করেনা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালামে তাকে কিয়ামত দিবসের প্রতি মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা হয়েছে।'

এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ এবং উৎসাহ ও প্রেরণামূলক হাদীস এত অধিক রয়েছে যে, যা একত্রিত করলে আলাদা এক গ্রন্থ তৈরী হয়ে যাবে। আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, প্রতিবেশী ক্ষুধার্থ হয়ে শুয়ে আছে এ কথা জেনেও যে ব্যক্তি উদরপূর্ণ করে খায়, তার এই খানা সম্পূর্ণ জায়েয ও হালাল উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত হলেও সে যেন জেনে রাখে যে, সে হারাম খাদ্য দ্বারা পেট পূর্ণ করল। (আল্লাহ এই অবস্থা থেকে আমাদের পানাহ দান করুন।)

খানার মধ্যে নিজের সঙ্গে অন্যকে শরীক করায় কতটুকু বরকত তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস দ্বারা অনুধাবন করুন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَن اَطعَمَ اَخَاهُ حَتّٰى يَشبَعَهُ وَسَقَاهُ حَتّٰى يَروِيَه بَعَّدَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ لِسَبعِ خَنَادِقٍ مَا بَينَ كُلِّ خَندَقَينِ مَسِيرَةُ خَمسِ مِأةِ عَامٍ

"যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে এই পরিমাণ খানা খাওয়াল যাতে তার পেট পূর্ণ হয়ে যায় এবং এইপরিমাণ পান করাল যাতে সে তৃপ্ত হয়ে গেল। (তার জন্যে এ সুসংবাদ যে) আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে এই পরিমাণ দূরে রাখবেন যতটুকু সাত খন্দকের দূরত্ব রয়েছে। প্রত্যেক খন্দকের মাঝে পাঁচশত বছরের দূরত্ব বিদ্যমান।"

আলোচিত হাদীসের প্রথম শব্দ তার ভাই -এর উপর দৃষ্টি ফেলুন। এখানে অভাবী ও ক্ষুধার্থকে ভাই বলা হয়েছে। চাই সে নিজের ভাই হোক বা অন্য গোত্রের কেউ হোক না কেন।

মেহমানের পছন্দীয় খানা

ইসলামী সমাজে মেহমানদের আদর আপ্যায়ন উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ পরম মেহমান নাওয়ায ছিলেন। তাদের নিকট একজন মেহমান রহমতের ফিরশতার চেয়ে কম ছিল না। মেহমানের খাতিরে তাঁরা স্বীয় আরাম আয়েশ কুরবানী করে দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীতো মেহমানদারীতে বিরল দৃষ্টান্তই স্থাপন করে গেছেন। ঘটনা এই যে, একদিন সেই সাহাবীর ঘরে এতটুকু খানা ছিল যাতে কোন রকমে একজনের চলে। এমতাবস্থায় রাত্রি বেলায় এক মেহমান এল। স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করে নিলেন। খানা দস্তর খানায় রেখে (বাহানা করে) স্ত্রী বাতি নিভিয়ে দিলেন। আর স্বামী (বর্তনে) খালি হাত বুলাতে লাগলেন এবং খানা খাওয়ার শব্দের মত চপচপ করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য মেহমান যেন মনে করে যে, তিনিও মেহমানের সঙ্গে যথারীতি খানায় শরীক আছেন। এভাবে মেহমান তৃপ্তি সহকারে খানা খেয়ে নিল। সুবহানাল্লাহ! ভেবে দেখুন। তাদের মধ্যে আত্মত্যাগের কতই না জযবা ছিল।

মূলতঃ এগুলি সবই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও আমলী আদর্শের ফসল। হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

مَـنْ لَذَّذَ اَخَـاهُ بِمَا يَشْتَهِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَلْفَ اَلْفَ حَسَنَةٍ وَمُحِىَ عَنْهُ اَلْفَ اَلْفَ سَيِّئَةٍ .....

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে স্বীয় প্রিয় বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত করবে, আল্লাহ তাঁর আমল নামায় হাজার হাজার নেকী লিখে দিবেন। এবং তার হাজার হাজার গোনাহ মাফ করে দিবেন এবং তাঁর মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। আর তাকে তিনটি জান্নাত তথা জান্নাতুল ফেরদৌস, জান্নাতুল আদন এবং জান্নাতুল খুলদ থেকে খানা খাওয়াবেন।"

তাকাল্লুফ বা লৌকিকতার নিষেধাজ্ঞা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّفِ

"হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের লৌকিকতা দেখাতে নিষেধ করেছেন। –শামায়েলে তিরমিযী

হাদীস বিশারদগন তাকাল্লুফ বা লৌকিকতার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেনঃ "কষ্টের সঙ্গে এমন কোন বিষয় বা এমন কোন কাজ করা যার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নাই এবং যাতে কোন উপকারও হয় না।"

আল্লাহ ঐ সকল বুযুর্গদের উত্তম বদলা দান করুন যারা আরবের সর্বাপেক্ষা বড় ভাষাবিদ এবং আল্লাহর সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অলৌকিক বর্ণনাকৃত বাণীর ব্যাখ্যাও এমন সুন্দরভাবে দিয়েছেন যা তাঁর শানের যথোপযুক্ত ছিল। তাকাল্লুফের উল্লেখিত ব্যাখ্যার ব্যাপারে একটু ভেবে দেখুন। তা কতই না অর্থবহ হয়েছে।

প্রতিটি এমন বিষয় যাতে কোন উপকার নাই এবং প্রত্যেক এমন কাজ যার কোন অর্থই হয় না, তা যদি বিশেষ কষ্ট স্বীকার করে সম্পন্ন করা হয় তবে সেটা তাকাল্লুফের মধ্যে গণ্য হবে। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেন ঃ

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَالَا يَعْنِيْهِ

"কোন ব্যক্তির জন্য ইসলামের সৌন্দর্য্য হল অযথা বা অনর্থক বিষয় ত্যাগ করার মধ্যে।" – মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহঃ)

আসুন! এখন এবার একটু আমাদের নিজের জীবনের কর্ম এবং বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিলা মেশা ও নিজের সামাজিক যিন্দেগীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখি, এতে উপকারী অনুপকারী বিষয় কি পরিমাণ প্রবেশ করেছে। আমার তো ধারণা আমাদের জীবনের সব কিছুতেই আমরা লৌকিকতার খোলস পড়ে আছি। আর ভেতরে সবই অন্তঃসার শূন্য–ফাঁকা।

খানায় তাকাল্লুফ

সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَّا نَتَكَلَّفَ لِلضَّيْفِ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا وَاَنْ نَتَقَدَّمَ اِلَيْهِ مَا حَضَرَنَا

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের নিকট যা নাই মেহমানদের খাতিরে তা যোগাড় করতে গিয়ে কষ্ট উঠাবে না। বরং যা কিছু উপস্থিত আছে তাদের সামনে তাই দিবে।"

তাবরানী নামক হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়টি দু একটি শব্দের পরিবর্তন সাপেক্ষে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَتَكَلَّفَ لِلضَّيْفِ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا

"আমাদের নিকট যা নাই মেহমানদের খাতিরে তা নিয়ে কষ্ট উঠাতে আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।"

অনেক সময় আমরা এ ধরনের তাকাল্লুফের শিকার হয়ে থাকি। যার ফলে একদিকে মেহমান এক প্রকার লজ্জায় পড়ে যায় এবং আমরা পেরেশান হই। আর এ কারণে রহমতের ফিরিশতাকে অর্থাৎ মেহমানকে আমরা বিপদের মূল মনে কর।

উম্মী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব ভাল করেই জানতেন, উপলব্ধি করতেন। তাই তিনি মেহমানদের ব্যাপারে তাকাল্লুফ করতে নিষেধ করার সঙ্গে সঙ্গে এর হেকমতও বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, فَتَبْغَضُوْهُ অর্থাৎ এ ভাবে তোমরা মেহমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করবে। আর যে ব্যক্তি মেহমানের প্রতি বিদ্বেষ রাখে সে যেন আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ রাখে এবং যে আল্লাহর সঙ্গে বিদ্বেষ রাখবে আল্লাহও তাকে ঘৃণা করবেন। চিন্তা করে দেখুন! তাকাল্লুফের ধারাবাহিকতা কোথায় গিয়ে শেষ হয়।

পেট কিভাবে পূর্ণ হবে?

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَنَا نَاْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيْهِ -

আজকাল অধিকাংশ লোকেই বে-বরকতের অভিযোগ করে থাকে। প্রতিটি লোকেই অনুভব করে যে, জিনিসের মধ্যে বরকত নাই। বিশেষ করে খানার মধ্যে বরকত একেবারে নাই বললেই চলে। মানুষ খুব খায়, পেটও ভরে। কিন্তু 'পরিতৃপ্তি' বলতে যা বুঝায় তা লাভ হয় না। খেতে খেতেই আবার ক্ষুধা লাগে।

এমনটি কেন হয়? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত ওয়াহশী (রাযিঃ)-এর বর্ণিত নিম্নোল্লিখিত হাদীসে উক্ত প্রশ্নের জবাব রয়েছে।

তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণ একদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খানা খাই, কিন্তু আমাদের তৃপ্তি মিটে না। নবী করীম (সাঃ) বললেন, "সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথক ভাবে খানা খাও? সাহাবীগণ আরয করলেন, হ্যাঁ, (আমরা পৃথক

পৃথক ভাবে খাই)। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমরা একত্রে খানা খাবে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খানা খাবে; মেহেরবান আল্লাহ এতে তোমাদের খানায় বরকত দান করবেন। –সূনানে আবূ দাঊদ

একত্রে খানা খাওয়ায় শুধুমাত্র দু'জনের খানা তিনজনের এবং তিন জনের খানা চারজনের জন্যে যথেষ্ট হওয়ার বরকত লাভ হয় না বরং উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একত্রে খানা খাওয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তির পরিতৃপ্তিও অর্জিত হয়। আর সেই সঙ্গে আল্লাহর নামে খানা শুরু করলেতো نُوْرٌ عَلٰى نُوْر অর্থাৎ তাতে খুব বেশী বরকত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদও সত্য। অতএব খানার মধ্যে কষ্টে পড়া প্রকৃত পক্ষে নিজেদেরই কর্মফল বৈ আর কিছুই নয়।

খাওয়ার পর

খাওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি সুন্নত বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যকঃ

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার পর হাত মুখ ধৌত করাকে খানায় বরকত হওয়ার কারণ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

–সুনানে আবূ দাঊদ, তিরযিমী

হযরত আনাস (রাযিঃ) এর বর্ণনা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তায়ালা তার ঘরের বরকত বৃদ্ধি করে দেন, তার উচিত যখন খানা সামনে আসে তখন এবং দস্তর খানা যখন উঠিয়ে নেওয়া হয় (অর্থাৎ খানা শেষ হয়ে যায়) তখন হাত মুখ ধৌত করা।"

–কাযবীনী

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করার পর কুল্লি করতেন।

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন অতঃপর পানি চাইলেন ও কুল্লি করলেন, আর বললেন এতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে।

৩। পানাহারের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

৪। কারও বাড়ীতে দাওয়াত খেলে বাড়ীওয়ালার রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা ও বরকতের জন্য এই দুআ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

৫। কখনও কখনও এ দুআও করতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَهٗ وَسَوَّغَهٗ وَجَعَلَ لَهٗ مَخْرَجًا

খানা খাওয়ার পর দুআ

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাওয়ার পর নিম্নের শব্দগুলি দ্বারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ও দুআ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"সমস্ত প্রশংসা এবং শুকরিয়া আল্লাহর যিনি আমাকে আহার করিয়েছেন। পান করিয়েছেন এবং আমাকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের শরীর ও দেহের জন্য যেমন অনুগ্রহ করে খাদ্য দান করেছেন, তেমনি আমাদের আখেরাতের মুক্তির জন্য ইসলামের মত দৌলত দান করেছেন।"

সমস্ত দিনরাত আল্লাহ তা'আলা যে অসংখ্য নিয়ামত দান করছেন তার পরিবর্তে শুকরিয়া হিসাবে এ কয়েকটি শব্দ উচ্চারণের কি যথার্থতা (হাকীকত) থাকতে পারে। মূলতঃ আসল উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে শুকরিয়া এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জযবা ও মানসিকতা সৃষ্টি করা।

হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে দস্তরখানা উঠানো হলে তিনি নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

খানার দাওয়াতকারীর জন্য দুআর শব্দগুলি হল ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

"হে আল্লাহ! দাওয়াতদাতাদের রিযিকের মধ্যে বরকত দান করুন। তাদের মাফ করে দিন এবং তাদের উপর রহমত করুন। হে আল্লাহ! যিনি আমাকে খানা খাওয়ালেন তাকে আপনার করুণা ও দয়ায় খানার মধ্যে প্রাচুর্য ও বরকত দান করুন। আর যিনি আমাকে পান করালেন তাকে গায়েব হতে পান করান।

অধ্যায় ঃ ৭

পানি পান করার আদব এবং উপদেশ

শিরোনাম দ্বারাই বুঝা যায় যে, আমি এ অধ্যায়ে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পান করা সম্পর্কিত হাদীসগুলি একত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছি। আর এ ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যেন কোন হাদীস বাদ না পড়ে যায়। তবে আমি কখনো এই দাবী করছি না যে, এই বিষয়ের সবগুলি হাদীসই আমি একত্রিত করেছি। কোন হাদীস তো এ জন্যও রয়ে গেছে যে, আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বিষয়বস্তুর সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক নাই মনে করে উল্লেখ করি নাই।

বসে বসে পানি পান করা, ডান হাত দ্বারা বর্তন ধরা, অল্প অল্প করে কমপক্ষে তিন চুমুকে পানিপান করা, পানি পান করার পূর্বে–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এবং পান করার পর الحمد لله বলা। স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার না করা। পানির পাত্র খোলা না রাখা। পানির পাত্রে ফুঁক না দেওয়া এগুলি সব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেরই অংশ বিশেষ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় পানীয়

عَنْ عَائِشَةَ صِدِّيْقَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ اَحَبَّ الشُّرْبِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْوُ الْبَارِدُ

"হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাপেক্ষা পছন্দীয় পানীয় ছিল ঠান্ডা মিষ্টি পানীয়।"
–মুসতাদরাকে হাকেম

হযরত সুহাইব (রাযিঃ) স্বীয় দাদার ভাষায় বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্মরণ রেখো, দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে পানি হল পানীয় জিনিসের সর্দার। –মুসতাদরাক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী দ্বারাও পানির গুরুত্ব আরো বেশী উপলব্ধি করা যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে বান্দার নিকট থেকে সর্বপ্রথম যে হিসাব গ্রহণ

করা হবে তা হলো আল্লাহ তা'আলা তার সুস্থতা ও ঠান্ডা পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।" –মুসতাদরাক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত ইরশাদ হতে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অবগত হইঃ–

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় জিনিসের মধ্যে ঠান্ডা এবং মিষ্টি পানীয় পছন্দ করতেন। বাস্তবেও ঠান্ডা পানি পান করায় অন্তরে আনন্দ আসে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মুখে আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর শুকরিয়া এসে যায়।

(২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাণ্ডা পানিকে আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত মনে করতেন এবং ঠান্ডা পানি পছন্দ করতেন।

(৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পানি উভয় জাহানের পানীয় জিনিসের সর্দার। আর তা দু'টি নিয়ামতের একটা যার সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে। সুতরাং আমাদেরকে পানির প্রত্যেকটি ফোঁটার যত্ন নেওয়া ও কদর করা আবশ্যক।

পানি পান করার আদব

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ الْمَاءَ مَصًّا وَلَا يَعُبَّ عَبًّا فَإِنَّهُ مِنَ الْكِبَادِ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পানি পান করতে চায়, সে যেন চুমুক দিয়ে দিয়ে পান করে এবং পশুর মত পানিতে মুখ লাগিয়ে পান না করে কারণ এতে কলিজা বেদনা হয়।" –বায়হাকী, যাদুল মাআদ

প্রচন্ড গরম পড়লে পিপাসায় অস্থির হয়ে অনেকে এক নিঃশ্বাসেই ঘোট ঘোট করে সমস্ত পানি শেষ করে ফেলতে চায়; এতে কখনও পিপাসা নিবারণ হয় না বরং গলায় পানি আটকে যাওয়ার ভয় থাকে এবং এতে পেট নিঃসন্দেহে ভারী হয়ে যায়। অপরদিকে অল্প অল্প করে চুমুক দিয়ে দিয়ে পান করলে সামান্য পানিতেই পিপাসা মিটে যায় এবং কোন সমস্যায়ও পড়তে হয় না।

তাছাড়া পানিতে মুখ ডুবিয়ে পান করা পশুর স্বভাব। এতে নাক মুখের দুষিত নিঃশ্বাস টাটকা পানিকে নষ্ট করে ফেলে। দাড়ি মোচের চুল এবং ময়লা পরিষ্কার পানিকে নোংরা করে দেয়।

পানি পান করার নিয়ম

لَا تَشْرَبُوا نَفَسًا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ وَلٰكِنْ اشْرَبُوا مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ فَرَغْتُمْ ـ

"উটের মত এক দমে গট্‌গট, করে পান করো না বরং দু'তিন দমে পান কর। পান করার সময় আল্লাহর তা'আলার নাম লও অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বল এবং পান করার পর আল্লাহর প্রশংসা কর। আর প্রশংসার সর্বাপেক্ষা উত্তম বাক্য হল-আলহামদুলিল্লাহ।"

উপরোল্লেখিত হাদীসে তিনটি উপদেশ রয়েছে ঃ

(১) প্রথমতঃ পানি এক দমে গট্‌গট্‌ করে উটের মত পান না করে অল্প অল্প করে পান করা উচিত। অধৈর্য্য হয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে পানি পান করা উটের স্বভাব, আর এতে কয়েক প্রকার অসুবিধাও রয়েছে। এভাবে পান করায় পানি হলকুমে আটকে যেতে পারে। এতে হৃদযন্ত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পিপাসা আরও তীব্র হয়। পরিতৃপ্তি আসে না।

(২) দ্বিতীয়তঃ শুরুতে আল্লাহর নাম নিয়ে পান করা উচিত। এতে হাজারও বরকত রয়েছে। মানুষ স্বভাবতঃই বিসমিল্লাহ বলে কোন হারাম জিনিস মুখে নিতে পারে না বা কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে পারে না। তাছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করলে যে প্রশান্তি হাসিল হয় অন্য কোনভাবে তা সম্ভব নয়।

(৩) তৃতীয় উপদেশ হল ঃ আল্লাহর নিয়ামত দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়ার পর তাঁর শুকরিয়া আদায় কর। অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

তিন ঢোক

আপনারা আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পাঠ করেছেন যাতে পানি পান সম্পর্কে তিনটি উপদেশ রয়েছে। এখন এ সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ও আমল কি ছিল তা লক্ষ্য করুন।

নিম্নের হাদীস বর্ণণাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ عَلَى الْإِنَاءِ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ يَحْمَدُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ نَفَسٍ وَيَشْكُرُهُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিছু পান করতেন তখন তিন ঢোকে পান করতেন, প্রত্যেক ঢোকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতেন এবং সর্বশেষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।"

অল্প অল্প করে পানি পান করার ফযীলত ও উপকারিতা অনেক। এই সবগুলি ফযীলতই মানুষের নিজের সাথে সম্পৃক্ত। আধ্যাত্মিকতা বা আচার ব্যবহারের সঙ্গে এর কোন সংযোগ নাই। কিন্তু ইসলাম শুধু মাত্র আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক শিক্ষার মাযহাব নয় রবং এটা মানুষের সার্বিক উন্নতির আহ্বানকারী এবং সর্বপ্রকার পরিপূর্ণতার জিম্মাদার। সুতরাং ইসলাম যিন্দেগীর সর্বপর্যায়ে পথ প্রদর্শন করে। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাস্তব জীবনে আমল করে সবকিছু দেখিয়েছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমরা যেন তাঁর কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে নিজেদের জন্য বরকত লাভে সক্ষম হই।

বসে পানি পান করা

খানা-পিনার আদবের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সেগুলি নিজ নিজ অভ্যাসে পরিণত করা জরুরী। নিম্নের হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রাযি) বলেন ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যেন দাঁড়িয়ে কিছু পান না করে।"

আজকাল আমাদের ছোট বড় কেউই ইসলামের এ আদবটির প্রতি দৃষ্টি দেয় না বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানাহার করাটাকে একটা ফ্যাশন মনে করে।

এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর এক সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে পানি পান করবে না; ভুল ক্রমে পান করে ফেললে বমি করে দিবে।" – মুসলিম শরীফ

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানাহার করা ফ্যাশন তো ঠিকই তবে ভাল ফ্যাশন নয়। দোজাহানের বাদশাহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে যা উত্তম সেটাই ভাল ফ্যাশন। কারণ তাঁর কোন নির্দেশ ও কাজই হেকমত থেকে খালি নয়।

যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের পানি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন পান করতেন, এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, যেহেতু যমযমের পানির নিকট লোকজনের খুবই ভীড় ও জনসমাবেশ হয় তাই মানুষের কষ্ট কিছুটা কমানোর জন্য এভাবে পান করতেন। সেহেতু এখন যমযমের পানি কিবালা মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করা উম্মতের জন্য সুন্নত। এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের একটা নগন্য উদাহরণ। তবে এ ধরনের ছোট ছোট বিষয়ও জীবনের মোড় পরিবর্তন করে ফেলে এবং একটি সুন্দর সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

পানিতে নিঃশ্বাস ফেলো না

আমি পানি পান করার আদব সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত বাণী সমূহ চিহ্নিত করছি।

* বিসমিল্লাহ বলে পানি পান করবে।

* এক শ্বাসে পানি পান করবে না বরং তিন শ্বাসে অল্প অল্প করে পান করবে।

* পানি পান করে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করবে, যার সুন্নতি শব্দগুলি হল 'আলহামদুল্লিাহ'।

* নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এ পদ্ধতিতে পানি পান করতেন, এমনকি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ঢোকেই 'আল হামদুল্লিাহ' বলতেন এবং পরিশেষে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

* পানি পান করার ৪র্থ আদব হল দাঁড়িয়ে পান না করা। পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে আজ বুফে সিস্টেম (Buffet) আধুনিক সভ্যতার এক বিশেষ নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে।

* শুধুমাত্র যম্‌যমের পানি দাঁড়িয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে পান করা সুন্নত। এভাবে পান করার হেকমত সুস্পষ্ট।

প্রথমতঃ যম্‌যম্ কূপের নিকট হিজায ও অন্যান্য স্থান থেকে আগত লোকদের ভীড়; দ্বিতীয়তঃ কূপের সম্মান ও পবিত্রতা।

* এখন পানি পান করার আদব সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একটি হাদীস পেশ করছি ঃ

হযরত ইকরামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ اَوْ يَنْفَخَ فِيْهِ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।" –মুসতাদরাক

পানির পাত্রের মধ্যে হুক্কার মত গড় গড় করা, পানি পান করার বর্তনের মধ্যে ফুঁক মারা স্বাস্থ্য নীতিরও পরিপন্থি। বিশেষতঃ যদি এ সকল পাত্রে অন্য কেউ পান করে তাহলে তো কথাই নাই। চিন্তার বিষয় হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীগুলির হিকমত ও দর্শন কতইনা মূল্যবান। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ স্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক যে সকল তত্ত্ব আজ প্রমাণ করছেন তা শত শত বৎসর পূর্বেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযি)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনা বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমাদের কেউ কোন পাত্রে পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলো না।"

وَلٰكِنْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّتَنَفَّسَ فَلْيُؤَخِّرْهُ عَنْهُ ثُمَّ يَتَنَفَّسْ

"যদি শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে পাত্র সরিয়ে শ্বাস নাও।" –মুসতাদরাক গ্রন্থে এ সম্পর্কে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ

"তোমাদের কেউ কিছু পান করার সময় পাত্রের মধ্যে ফুঁক দিবে না।" বস্তুতঃ এটাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আমল ছিল। যার আলোচনা ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।

পানি পান করার পর দুআ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করার পর যে দুআ পাঠ করতেন এ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হল। এই দুআর বর্ণনাকারী হযরত আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (রাযিঃ) বলেন,

كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ الشُّرْبِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْمَاءَ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

"কিছু পান করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি স্বীয় রহমতে পানিকে মিষ্টি ও সুস্বাদু বানিয়েছেন এবং আমাদের অপরাধ সত্ত্বেও এটাকে লবণাক্ত ও খারযুক্ত করেন নাই।" –তাবরানী

আল্লাহ! আল্লাহ!! মানব কূলের শিরোমণি, বিশ্বজাহানের সর্দার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর দরবারে কতই না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। মূলতঃ পানি মিষ্টি ও সুস্বাদু হওয়া একমাত্র সেই মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলারই রহমত। আল্লাহর কোন বান্দা এমন আছেন যিনি এ নিয়ামতকে তার নেক কাজের প্রতিফল হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারেন ? আমাদের নেকের পাল্লা এমন কী ভারী হয়ে গেছে যার ফলে আমরা আল্লাহর এই নিয়ামতের হকদার হয়ে গেছি?

দুআর দ্বিতীয় অংশে রহমতের আধার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মত গোনাহগার উম্মতদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বিপর্যয় যে ধরনেরই হোক না কেন তা বান্দার নিজেরই কর্মের প্রতিফল। তা না হয় পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর পিতা-মাতার চেয়েও বহুগুণে স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র।

রূপার পাত্র

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রা স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ

"যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে (যেন) নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে।"– বুখারী, মুসলি ম শরীফ

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সরলতা, অনাড়ম্বরতা শিক্ষা দেয় এবং সরলতা প্রিয় করে। ইসলামী শিক্ষা শুধু মাত্র ওয়াজ ও বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আমলী যিন্দিগীর মধ্যে সচেতনভাবে এগুলির বাস্তবায়নও একান্ত জরুরী। যার একটা দৃষ্টান্ত হল স্বর্ণ, রূপা, রেশম ও সিল্কের পোশাক ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামী হুকুম সংক্রান্ত আমল।

প্রথমতঃ ইসলাম যাকাতের সম্পদ বন্টনের মাধ্যমে স্বর্ণ-রূপা সঞ্চয়ের সুযোগ কমিয়ে দিয়েছে এবং সামর্থশীলদের সঞ্চয়ের মধ্যে গরীব নিঃস্বদের অংশীদার করেছে। স্বর্ণ-রূপা ব্যবহার মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। পুরুষের জন্য এগুলির ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

উপরোল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী স্বর্ণ রূপার বর্তন নারী পুরুষ সকলের জন্যই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কারণ এতে ধনীদের ঘরে সম্পদ জমা হত এবং তাদের ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হত। আর অন্যদিকে দরিদ্রদের মন ছোট হয়ে যেত। এভাবে ইসলামের স্বাভাবিক সহজ সরলতা একেবারেই খতম হয়ে যেত।

স্বর্ণ রৌপ্যের বর্তন

রূপার পাত্রে পানি ইত্যাদি পান করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছি। এখানে শুধু খানা পিনা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো কয়েকটি ইরশাদ পাঠ করুন।

(১) হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, ''নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রেশম ও সিল্কের পোষাক পরিধান করতে এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বর্তন ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন যে,

هُنَّ لَهُمْ فِى الدُّنيَا وَهِىَ لَكُمْ فِى الاٰخِرَة

''এই জিনিসগুলি কাফেরদের জন্য দুনিয়ায় এবং তোমাদের জন্য আখেরাতে রয়েছে।'' –বুখারী, মুসলিম

(২) নবী করীম সসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবী থেকেই অন্য এক রেওয়ায়াত হল 'আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, রেশম ও সিল্কের কাপড় পরিধান করো না এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করো না এবং স্বর্ণ রৌপ্যের বাটিতে খেয়ো না।'' –বুখারী ও মুসলিম শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সমূহের উপর সাহাবায়ে কেরামগণ কিভাবে আমল করেছেন সে সম্পর্কে মিশকাত শরীফের একটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আনাস ইবনে সিরীন বলেনঃ

আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) -এর সঙ্গে অগ্নি পূজকদের একটা জামাআতের নিকট ছিলাম। এক ব্যক্তি স্বর্ণের পাত্রে এক প্রকার হালুয়া নিয়ে এল। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) খেলেন না। হালুয়া নিয়ে আসা

লোকটিকে বলা হল এটা পাল্টিয়ে আন। হালুয়ার পাত্র পরিবর্তন করে আনা হলে তিনি তা খেলেন। – বায়হাকী

পানিতে ফুঁক দেওয়া

বর্তমান যুগে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সরকারগুলি এ জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করছে। করপোরেশন ও পৌরসভাগুলিতে যথারীতি স্বাস্থ্য বিভাগ খোলা হচ্ছে। জনসাধারণ ধারণা করছে এগুলি সবই পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। পক্ষান্তরে ইসলাম স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উপর যতটুকু গুরুত্বারোপ করেছে অন্য কোন শিক্ষা এতটুকু গুরুত্ব দেয় নাই। বরং ইসলাম তো পরিচ্ছন্নতা অপেক্ষা পবিত্রতার আবশ্যকতায় আরো এক ধাপ অগ্রসর। কারণ অন্যদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আছে বটে কিন্তু পাক পবিত্রতা বলতে কিছুই নাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি) বলেন ,

لَمْ يَكُنِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنفُخُ فِى طَعَامٍ وَّلَا شَرَابٍ وَّلَا يَنفُسُ فِى الْإِنَاءِ

''নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা এবং পানীয়ের মধ্যে ফুঁক দিতেন না এবং বর্তনের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতেন না।'' সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যখন এটা করতেন না তখন অপরকে এমনটি করার অনুমতি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী হযরত ইকরামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তনে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।'' – আবূ দাউদ, তিরমিযী

''হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানিতে ফুঁক দিতে নিষেধ করলে এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি গ্লাসে ক্ষতিকর কিছু দেখি তবুও কি ফুঁক দেব না? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এটা ফেলে দিও।''

মশকীযা বা কলস থেকে পানি পান করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى ا للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَنْ يَشْرَبَ مِنْ فِى السِّقَاءِ اَوِ الْقِرْبَةِ -

"হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশক বা মশকীযায় মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।"
—রিয়াযুস সালেহীন

হাদীসে উল্লেখিত ছিকা এবং "কিরবাহ" উভয় শব্দ মশক -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে উভয়ের আকৃতি ও পুরুত্বের মধ্যে কম বেশী পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। শাব্দিক অর্থের পেছনে না পড়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ কি? তাই দেখা উচিত। আর তা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিষেধাজ্ঞার হেকমত খুব সহজেই বুঝে আসে। প্রথমতঃ ভরা মশকে মুখ লাগালে পানির মধ্যে এর প্রভাব পড়বে। আর যদি আল্লাহ না করুন পানকারীর দাঁতে অসুখ থাকে বা মুখে অন্য কোন সমস্যা থাকে তবে এর প্রতিক্রিয়া সমস্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়বে। আর এটা স্বাস্থ্য রক্ষা নীতির পরিপন্থী হবে।

দ্বিতীয়তঃ ভরা মশক থেকে পানি পান করায় কিছু পানি অবশ্যই পড়ে নষ্ট হবে। আর কোন কিছুই নষ্ট করা কখনও বৈধ হতে পারে না। অধিকন্তু পানি আল্লাহর নিয়ামত সমূহের একটা বড় নিয়ামত।

এতদ্ব্যতীত এটা একটা কুদরতী বিষয় যে, ভরা মশক থেকে নিশ্চিন্ত মনে শান্তির সঙ্গে পান করা মুশকিল। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত হল ধীরে ধীরে কম পক্ষে তিন ঢোকে পান করা। স্বাস্থ্য বিধিমতে এটা একটা জরুরী বিষয়।

এই নিষেধাজ্ঞার চতুর্থ হিকমত হল, মশক থেকে পানি পান করায় কিছু পানি পতিত হয়ে ছিটে কাপড়ে লাগার খুবই সম্ভাবনা থাকে যা পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ভাঙ্গা পাত্রে পানি পান করা

"আবূ দাউদ শরীফের রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের ভাঙ্গা অংশের দিক থেকে পানি পান করতে এবং পানীয়ের মধ্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।" —জাদুল মাআদ ঃ খন্ড ঃ ৩

রিয়াযুস সালেহীন এবং মিশকাত শরীফেও হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে ঃ

قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ يَعْنِىْ اَنْ تُكْسَرَ اَفْوَاهُهَا وَ يُشْرَبُ مِنْهَا

তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকীযা "একতেনাস"করতে অর্থাৎ মশকীযার মুখ ভেঙ্গে সেই মুখ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।"

উপরোক্ত দুইটি রেওয়ায়াত মিলিয়ে পাঠ করলে তা থেকে তিনটি বিষয় জানা যায় ঃ

১। পাত্রের ভাঙ্গা অংশ থেকে পানি পান না করা।

২। পানীয়ের মধ্যে ফুঁক না দেওয়া।

৩। মশকিযার মুখ ভেঙ্গে তথায় মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা।

"বর্তনের ভাঙ্গা অংশ থেকে পান করা যাবে না", নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ছবকের প্রথম হুকুমের মধ্যে অনেকগুলি হেকমত রয়েছে। কারণ এতে শুধু মাত্র ভাঙ্গা অংশের মাধ্যমে ঠোঁট কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বরং এ ধরনের ভাঙ্গা বর্তন পরিষ্কার করার সময় ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি বর্তনে থেকে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে। অথবা পূর্বের ব্যবহৃত দ্রব্যের কিছু লেগে থাকে। অথবা ক্ষতিকর লালা বা থুথু ইত্যাদি বর্তনে আটকে থাকে এবং ঐ দিক থেকে পানি পান করায় উক্ত ক্ষতিকর পদার্থ পেটের মধ্যে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

আমাদের ঘরে ব্যবহৃত মেটে এবং চিনা বর্তনের ক্ষেত্রে এ অবস্থাটি খুবই লক্ষ্য করা যায়। কারণ চিনা বর্তন, রেকাবী এবং অন্যান্য বর্তনের ভাঙ্গা অংশের মধ্যে নিঃসন্দেহে ময়লা ইত্যাদি জমে থাকে। পরিষ্কার করা সত্ত্বেও ভাঙ্গা অংশ থেকে এগুলি দূর হয় না।

আল্লাহ! আল্লাহ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি বাণী কতই না মঙ্গলজনক ।

পাত্র ঢেকে রাখবে

عَطُّو الْاِنَاءَ وَاَوْكُو السِّقَاءَ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বর্তন ঢেকে রাখবে এবং মশক (চামড়ার থলি যাতে করে পানি বহন করা হয়। আমাদের দেশে এর বিকল্প হিসাবে কলস ব্যবহৃত হয়ে থাকে) এর মুখ বন্ধ করে রাখবে।"
— বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র ইরশাদ করেন,

اَلَا خَمِّرُوْهُ وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ عُوْدًا

"কাঠের ঢাকনা দিয়ে হলেও দুধের বর্তন ঢেকে রেখো।"

চিকিৎসা শাস্ত্র মতে খানা-পিনা জাতীয় বস্তু খুবই সাবধানে রাখা উচিত। কেননা মাছি এগুলির উপর পাগলের মত ছুটে এসে বসে যায় এবং অসংখ্য রোগ জীবাণু সঙ্গে নিয়ে আসে। মাছির আক্রমণ ও উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়ার একটাই মাত্র উপায় আছে, তা হল খানা-পিনা ঢেকে রাখা।

পাত্র খোলা রাখার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর দিক হলো, পাত্রে এমন কিছু পড়তে পারে যা স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর এবং এতে রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণত প্রতি বাড়ীতেই টিক্‌টিকি বাস করে। এগুলির দেহাবয়ব শুধু বিশ্রী নয় বরং এর শরীর বিষাক্তও বটে। তাই কোন কিছু বিষাক্ত হওয়ার জন্য এর মধ্যে টিক্‌টিকি পতিত হওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং এ বিষয়টির প্রতি পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই।

একটু চিন্তা করে দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা কতটুকু হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল এবং তিনি কেমন উপকারী পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে গেছেন। শতশত বছর পরে ব্যাপক গবেষণা করে মানুষ আজ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, উম্মি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময়ই (১৪শত বৎসর পূর্বেই) তা বলে গেছেন। বস্তুতঃ সে ব্যক্তিই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করেছে যে তাঁর শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছে।

অধ্যায় ঃ ৮

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য এবং পছন্দনীয় খানা

হাদীস এবং ইতিহাস গ্রন্থ থেকে এমন অনেক খাদ্য সম্পর্কে জানা যায়, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুবই পছন্দনীয় ছিল। যে সকল খাদ্য সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত সূক্ষ্মদর্শী প্রাজ্ঞ ও পবিত্রতাপ্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রশংসা করতেন সে সকল খাদ্যের উপকারিতা নিয়ে আর কিইবা বলার থাকতে পারে। একজন প্রকৃত প্রেমিকের জন্যে তো এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে তার প্রেমাস্পদের নিকট কি পছন্দনীয় ছিল। আজ গবেষকদের কাজ হল চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে এগুলির বিস্ময়কর উপকারিতা ও ফলাফল বের করা।

বক্ষমান গ্রন্থের এই অধ্যায়টি পাঠকদের মনোযোগের বিশেষ কেন্দ্র বিন্দু হতে চায়। বিশেষতঃ যে পৃষ্ঠাগুলিতে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্যের আলোচনা রয়েছে। এতে জাতির নিঃস্ব ও দরিদ্র লোকদের জন্য যেমন সান্ত্বনা ও ধৈর্য্যের উপকরণ রয়েছে। তেমনি জাতির সম্পদশালী ও বিত্তবানদের জন্য রয়েছে ত্যাগ ও অল্পে তুষ্টির ছবক।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য সম্পর্কে আমরা হাফেয ইবনে ক্বাইয়্যিম (রহঃ)-এর ভাষায়, তাঁর "তিব্বে নববী" নামক কিতাব থেকে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত খাদ্য সমূহ কখনও একত্রে খেতেন না।

(১) لَمْ يَجْمَعْ قَطُّ بَيْنَ لَبَنٍ وَسَمَكٍ দুধ ও মাছ কখনও এক সঙ্গে খেতেন না।

(২) وَلَا بَيْنَ لَبَنٍ وَحَامِضٍ দুধ ও টক জিনিস কখনও একত্রে খেতেন না।

وَلَا بَيْنَ غِذَائَيْنِ حَارَّيْنِ وَلَا بَارِدَيْنِ وَلَا لُزِجَيْنِ وَلَا قَابِضَيْنِ وَلَا مُسْهِلَيْنِ وَلَا غَلِيْظَيْنِ وَلَا مُرْخَيْنِ وَلَا مُسْتَحِيْلَيْنِ اِلٰى خِلْطٍ وَّاحِدٍ

(৩) দু'টি গরম খাদ্য, দু'টি ঠান্ডা খাদ্য, দু'টি চর্বিযুক্ত খাদ্য, দু'টি আঠালো খাদ্য, দু'টি নরম খাদ্য, দু'টি শক্ত খাদ্য একত্রে খেতেন না, এমন দু'টি জিনিস একত্রে খেতেন না যা একই স্বভাবে পরিণত হবে।

وَلاَ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ كَقَابِضٍ وَّ مُسْهِلٍ وَسَرِيْعُ الْهَضْمِ وَبَطِيْئِهِ

(৪) বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী কোন জিনিসও একত্রে খেতেন না। যেমন, একটা আঠাল খাদ্য এবং একটা নরম খাদ্য, একটা দ্রুত হজম সম্পন্ন এবং অপরটা বিলম্বে হজম হওয়া খাদ্য এক সঙ্গে খেতেন না।

وَلاَ بَيْنَ شَوِى وَّ هَبِيْخٍ وَّلاَ بَيْنَ طَرِى وَّتَدِيْدٍ

(৫) ভুনা এবং রান্না খাদ্য, টাটকা এবং বাসী খাদ্য একত্রে খেতেন না।

–যাদুল মাআদঃ খণ্ডঃ ২

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিত্যাজ্য খাদ্য সমূহ

আল্লামা হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ)-এর ''যাদুল মাআদ' নামক সুপ্রসিদ্ধ কিতাব থেকে আমি পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য দ্রব্য সর্ম্পকে কিছু বর্ণনা দিয়েছি। এখন তাঁর এই সুবিখ্যাত কিতাব থেকেই সেই সকল খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করছি, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতেন না।

وَلَم يَكُنْ يَاْ كُلُ طَعَامًا فِى وَقْتِ شِدَّةِ حَرَارَتِه

(১) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যাধিক গরম জিনিস খেতেন না।

وَلاَ طَبِيْخًا بَائِتًا يَسْخَنُ لَهُ لِغَدٍ

(২) রাত্রের রান্না (বাসী) খাদ্য পরের দিন খেতেন না

وَلاَ شَيْئًا مِّنَ الاَطْعِمَةِ الْعَفِنَةِ وَالْمَالِحَةِ كَالْكَوَامِخِ

(৩) অনুরূপভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য পছন্দ করতেন না এবং চটপটি জাতীয় খাদ্য যেমন, চাটনি ইত্যাদিও পছন্দ করতেন না।

অত্যধিক গরম খাদ্য না খাওয়ার হেকমত এবং এর ক্ষতি কারো অজানা নয়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি নীতি ভুলে গিয়ে অনেক সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর খাদ্য থেকেও উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। বাসী এবং দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যের ক্ষতির প্রতিক্রিয়া কি তা কারো

অজানা নাই। চটপটি এবং চাটনি জাতীয় খাদ্য গ্রহণে গলা ও পাকস্থলীর যে রোগ সৃষ্টি হয় তা সকলেই অবগত। এতদসত্ত্বেও এ সকল খাদ্য থেকে যদি আমরা বিরত থাকতে না পারি তবে তা দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যেতে পারে?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপছন্দনীয় খাদ্য

'হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযিঃ)-এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবূ আইয়্যুব (রাযিঃ) যখনই খানা খেতেন তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাদ্যের কিছু অংশ পাঠিয়ে দিতেন। এ নিয়মে একদিন তিনি কিছু খানা পাঠালেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খানা খেলেন না। তখন আবূ আইয়্যুব (রাযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে খানা না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর মধ্যে পেঁয়াজ মিশ্রিত রয়েছে। তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেঁয়াজ কি হারাম? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উত্তরে বললেন,

وَلٰكِنِّى اَكْرَهُهُ مِنْ اَجْلِ رِيْحِه

"হারাম নয় বটে, তবে দুগর্ন্ধের কারণে আমি এটা পছন্দ করি না।"

–তিরমিযী

তিনি যে শুধু পেঁয়াজ খাওয়া থেকেই বিরত থাকতেন তা নয় বরং দুর্গন্ধযুক্ত এমন কোন জিনিসই তিনি খেতেন না যদ্দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়। নিম্ন বর্ণিত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়।

''হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আবী ইয়াযিদ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমাকে উম্মে আইয়্যুব (রাযিঃ) বলেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাড়ীতে তাশরীফ নিয়ে যান। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাদ্য তৈরী করলেন। যার মধ্যে কিছু শাক-সব্জিও ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত খাদ্য পছন্দ করলেন না। তিনি সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা খেয়ে নাও। আমি তোমাদের মত নই; আমার ভয় হয় যে, (এই খানায়) আমার সাথীদের তথা ফেরেশতাদের কষ্ট হবে।"

–তিরমিযী

ক্ষতিকর খাদ্যের প্রতিক্রিয়া দূরকরণ

যাদুল মাআদ নামক গ্রন্থ হতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে অত্যন্ত উপকারী কিছু বিষয় পূর্বে বর্ণনা করেছি। খাদ্য সংক্রান্ত অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে আল্লামা হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা বিষয়– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষতিকর খাদ্যের প্রতিক্রিয়া কি করে দূর করতেন তা বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন ঃ

كَانَ يَصْلِحُ ضَرَرَ بَعْضِ الْاَغْذِيَةِ بِبَعْضٍ اِذَا وَجَدَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً فَيَكْسِرُ حَرَارَةَ هٰذَا بِبَرْدَةِ هٰذَا وَيَبُوْسَةِ هٰذَا بِرَطُوْبَةِ هٰذَا

"যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ক্ষতিকর খাদ্য খেতেই হত তখন তিনি অন্য কোন ভাল খাদ্যের দ্বারা উক্ত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দূর করে নিতেন। অর্থাৎ ঐ জিনিসের গরম প্রতিক্রিয়াকে অন্য ঠান্ডা জিনিস দ্বারা এবং শুকনা জিনিসের প্রতিক্রিয়াকে আদ্র কোন জিনিস দ্বারা দূর করে নিতেন।"

অতঃপর আল্লামা হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) কাঁকড়ী ও তাজা খেজুরের উদাহরণ দেন, যা একটা অন্যটার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দূরে করে থাকে। এভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকনা খেজুরকে ঘি এবং মাখন-এর সঙ্গে মিশিয়ে খেতেন, যাতে ঘিয়ের মাধ্যমে এর শুষ্কতা দূর হয়ে যায়।

– যাদূল মাআদ ঃ খণ্ড ঃ ২

আবূ দাঊদ ও তিরমিযী শরীফে এরূপ একটি রেওয়ায়াতও বিদ্যমান রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুরের সাথে খরবুজা খেতেন এবং বলতেন যে, খরবুজা খেজুরের গরম দূর করে দেয়।

–যাদুল মাআদ ঃ খন্ডঃ২

গাভীর দুধ এবং ঘি

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عنه يرفعه عليكم بِلَبَنِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا شِفَاءٌ وَّسَمْنُهَا دَوَاءٌ وَلَحْمُهَا دَاءٌ

হযরত সুহাইব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা অবশ্যই গাভীর দুধ পান করবে। কেননা এর

মধ্যে শেফা রয়েছে এবং এর ঘির মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। আর এর গোশতের মধ্যে রোগ রয়েছে। – যাদুল মাআদ ঃ খন্ড ঃ ২

মুসদাতরাক গ্রন্থের "তিব্ব" অধ্যায়ের প্রথম হাদীস হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে এমন কোন রোগ-ব্যাধি পাঠান নাই যার ঔষধ প্রেরণ করেন নাই। আর গাভীর দুধের মধ্যে প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক রয়েছে।"

এই অধ্যায়েরই তৃতীয় হাদীসে শেফার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, فَاِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ কেননা গাভী সব ধরনের গাছের পাতা খেয়ে থাকে।" –মুসতাদরাকে হাকেম

হাকীকত হল, উট, মহিষ, ভেড়া, বকরী এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর তুলনায় গাভীর দুধ উত্তম। সকল প্রকার ক্ষতি থেকে মুক্ত এবং কতিপয় রোগের শেফা। এতদ্ব্যতীত গাভীর ঘি, এবং মাখনও বহু রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। চিকিৎসকগণ এটাকে ঔষধ হিসাবে ব্যবস্থা করে থাকেন।

তবে গরুর গোশত যেহেতু গরম, তাই এর গরম প্রতিক্রিয়া কিছুটা সমস্যাও সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু আমাদের কখনও একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, গরুর গোশত হালাল। আর হালাল কোন কিছুকেই নিজের জন্য হারাম মনে করার অনুমতি শরীয়ত কখনও দেয় নাই। তবে ডাক্তারী মতে গরুর গোশত খাওয়া না খাওয়া ভিন্ন কথা।

খেজুর এবং কাঁকড়ী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضـ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى ا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাজা খেজুর এবং কাঁকড়ী একত্রে খেতে দেখেছি।" – বুখারী, মুসলিম, মিশকাত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাওয়ার এই পদ্ধতিটি কতই না চিকিৎসা সম্মত ছিল। رُطَبٌ পাকা তরু তাজা খেজুরকে বলে। কাঁচা হোক বা শুকনা হোক খেজুর তাঁর নিজস্ব সর্বপ্রকার উপকারের সঙ্গে সঙ্গে গরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। খেজুরের প্রতিক্রিয়া এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিকিৎসা বিষয়ক 'আজওয়া খেজুর' শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

কাঁকড়ীকে আরবীতে কিস্সা বলা হয়। মূলতঃ কাঁকড়ী ভিজা পানসা হয়ে থাকে। এর স্বভাব প্রতিক্রিয়াও ঠাণ্ডা। ধনী দরিদ্র নির্বেশেষে সকলের জন্যেই এটা ফল এবং সব্জি দুইটিই। এটা পিপাসা, গরম, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং রক্তের চাপ ইত্যাদি কমিয়ে দেয়। অতি দ্রুত হজম হয়। –হায়াতে জিন্দিগী ঃ পৃঃ ১১৪

কাঁকড়ী অন্তরে শান্তি আনে। পেশাব সৃষ্টি করে। প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে। মূত্রদ্বার দিয়ে পূঁজ, রক্ত ইত্যাদি নির্গত হওয়া বন্ধ করে। মূত্রাশয়ের পাথর এবং মূত্র থলীর জন্য বিশেষ উপকারী।

–কিতাবুল মুফরাদাতঃ খাওয়াস্সুল আদবিয়া ঃ পৃঃ ২৭৮

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা কাঁকড়ীর মধ্যে শতকরা ৭৫˙৬ ভাগ প্রাকৃতিক পানি, জমা করে দিয়েছেন। ১/২ ভাগ মাংস, ২/৩ ভাগ শ্বেতসার বা মাড় রয়েছে। তাছাড়া এতে তৈলাক্ত পদার্থ, খনিজ লবণ, পটাশিয়াম, লাইম, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদিও বিদ্যমান রয়েছে।

–সিহহাত আওর তন্দুরস্তীঃ পৃঃ ২০

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর এবং কাঁকড়ী এক সঙ্গে খেতেন।

তরমুজ এবং খেজুর

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ يَقُوْلُ يَدْفِعُ حَرًّا هٰذَا بَرْدُ هٰذَا

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তরমুজ ও খেজুর একত্রে খেতেন আর বলতেন তরমুজ খেজুরের গরম দূর করে দেয়। আর তাজা খেজুর তরমুজের ঠান্ডা দূর করে। –আবূ দাউদ, তিরমিযী

رُطَبْ বা তাজা খেজুর সম্পর্কে আমরা একটু আগেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখানে بِطِّيْخ বা তরমুজ সম্পর্কে চিকিৎসকগণের গবেষণালব্ধ ফলাফলের সার নির্যাস তুলে ধরা হলঃ

তরমুজের স্বভাব প্রতিক্রিয়া ঠাণ্ডা, পিপাসা নিবারণকারী, (অধিক) পেশাব সৃষ্টিকারী ও কুষ্ঠ কাঠিণ্য দূরকারী। পিত্তজ্বর, দাহজ্বর, মূত্র জ্বালা, মূত্রাশয়ের পাথর, ক্ষত, ক্ষয়রোগ, বিরক্তি, শীর্ণতা এবং শুষ্ক কাশির জন্যও এর ব্যবহার বিশেষ ফলাদায়ক –কিতাবুল মুফরাদাত, খাওয়াছছুল আদবীয়াহ ঃ পৃঃ ১৩৭

তরমুজ গরমী, শুষ্কতা, পিত্ত, পিপাসা এবং রক্তের জোস সমভাবে দূর করে থাকে। এত উপকারী হওয়া সত্ত্বেও এটা বিলম্বে হজম হয়, মর্দামী শক্তি কমিয়ে দেয়। উত্তেজনা সৃষ্টি করে। (সিহহত ও যিন্দিগী ঃ পৃঃ ১১৩)

তরমুজ সম্পর্কে আলোচিত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবুন এবং একটু চিন্তা করে দেখুন, খেজুরের সঙ্গে তরমুজের ব্যবহার কতটুকু উপকারী এবং সর্বপ্রকার ক্ষতিকর দিক থেকে কিভাবে বেঁচে থাকা যায়।

খেজুর এবং মাখন

عَنْ اِبْنَى بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ قَالاَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ-

বুসর সুলামী (রাযিঃ)-এর দুই পুত্র (আতিয়া এবং আবদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তাঁরা বলেন, আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাশরীফ আনলেন। আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাজা খেজুর এবং মাখন রাখলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাখন এবং তাজা খেজুর পছন্দ করতেন।

–মিশকাত শরীফ, যাদুল মাআদ ঃ খন্ডঃ ৩

আরবে বিভিন্ন প্রকার খেজুর জন্মে থাকে। বিশেষ করে মদীনা মুনাওয়ারায় হরেক রমক খেজুর পাওয়া যায়।

তন্মধ্যে আজওয়া, সালবী, জ্বলি ইত্যাদি খেজুরের বৈশিষ্ট্য হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। আম্বর খেজুর সম্ভবতঃ আকারে সবচেয়ে বড়, সুস্বাদু ও দামী খেজুর। সুবাখখাল খেজুর শুষ্ক ও উগ্র স্বভাবের হয়ে থাকে। এটাকে বীচি হীন বাজে ফল মনে করা হয়। আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকেরা এ ধরনের বীচি হীন খেজুরকেই আজওয়া মনে করে থাকে।

উপরোল্লিখিত হাদীসে "তামার"কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় খেজুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'তামার' শুকনা খেজুরকে বলা হয়। সুবহানাল্লাহ! প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মভূমির তাজা খেজুর সর্ম্পকে কি আর বলব। সে খেজুর কতইনা সুস্বাদু ও মিষ্টি হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, এটা নবী করীম (সঃ)-এর খুব পছন্দনীয় এবং তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় খাদ্য গোশত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় খাদ্যের মধ্যে গোশত সর্বদা তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করেছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত খুবই পছন্দ করতেন এবং খুবই প্রশংসা করতেন। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর ইরশাদ লক্ষ্যণীয় ঃ

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ طَعَامِ اَهْلِ الدُّنْيَا وَاَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, দুনিয়া এবং জান্নাতবাসীদের প্রধান খাদ্য গোশত। –ইবনে মাজাহ, যাদুল মাআদ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্য এক সাহাবী হযরত বুরাইদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُ الْاِدَامِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اللَّحْمُ

"দুনিয়া এবং আখেরাতের সর্বাপেক্ষা উত্তম সালুন হল গোশত।"

–যাদুল মাআদ

এ সকল বর্ণনাসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তিগতভাবেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গোশত পছন্দনীয় খাদ্য ছিল। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় খাদ্যের উপকারিতা সূর্যের মত স্পষ্ট। পৃথিবীর সকল হেকিম ও চিকিৎকগণ এ ব্যাপারে একমত যে গোশতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ জীবনীশক্তি রয়েছে। অন্য কোন বস্তুর মধ্যে সম্ভবত গোশতের মত এত শক্তিবর্ধক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মজবুতকারী শক্তি নাই। সবচেয়ে বড় কথা হল, যে জিনিস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণ করতেন, আমাদের এত কিছু তাহকীকেরও প্রয়োজন নাই। তবে যদি সে বিষয়ে তাহকীক করতে হয় তবে সেটা মনের এতমিনান ও ঈমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হতে হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দনীয় গোশত

গোশতের মধ্যে বাজু এবং গর্দানের গোশত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব পছন্দনীয় ছিল। সুবহানাল্লাহ! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্বাচন কতই না ক্রটিমুক্ত ও যুক্তিযুক্ত ছিল।

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে কিছু গোশত নিয়ে আসা হল এবং তার মধ্য হতে বাজুর গোশত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এগিয়ে দেওয়া হল। তিনি বাজুর গোশত পছন্দ করতেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গোশত দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেলেন।" – তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার মধ্যে এ শব্দ সমূহ এসেছে ঃ

اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَ تُعْجِبُهُ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গোশত আনা হল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বাজুর গোশত পছন্দনীয় ছিল তাই উত্তম গোশতের মধ্যে হতে বাজুর গোশত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হল।"

–যাদুল মাআদ ঃ খন্ডঃ ২, বুখারী ও মুসলিম শরীফের বরাতে

গর্দানের গোশতের ব্যাপারে হযরত যুবায়াহ বিনতে যুবাইর (রাযিঃ)-এর বর্ণনা লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন, আমরা একবার আমাদের বাড়ীতে বকরী জবাই করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর পাঠালেন যে, আমার অংশ পাঠিয়ে দিন। আমি বললাম, শুধু মাত্র গর্দানের গোশত অবশিষ্ট আছে এবং এটা পাঠাতে আমার লজ্জা হচ্ছে। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাল্টা বলে পাঠালেন, এটাই পাঠিয়ে দিন। গর্দানের গোশত বকরীর উত্তম অংশ। গর্দানের গোশত ভালর নিটকতর এবং ক্ষতি থেকে দূরতর।

–যাদুল মাআদ ঃ খন্ডঃ ২

এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গোশত খুব প্রিয় ছিল, বিশেষ করে বাজু এবং গর্দানের গোশত আরও অধিক প্রিয় ছিল।

প্রিয় গোশত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন গোশত প্রিয় ছিল? এই প্রশ্নের জবাবে সাহাবায়ে কিরামদের (রাযিঃ) নিম্নোল্লিখিত বর্ণনা সমূহও পাঠ করুন। সবগুলি হাদীসই শামায়েলে তিরমিযী হতে লওয়া হয়েছে।

(১) হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَّشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ

"তিনি (হযরত উম্মে সালমা রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ভুনা রান নিয়ে গেলে তিনি তা খেলেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِوَاءً

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস (রাযিঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ভুনা গোশত খেয়েছি।"

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ

(৩) "হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁধের গোশত পছন্দ করতেন।"

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى ا للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁধের গোশত সর্বাপেক্ষ বেশী পছন্দ করতেন।"

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই পিঠের গোশত সর্বোত্তম।"

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ...... ثُمَّ رَأَهُ أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ

(৫) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ .... অতপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বকরীর কাঁধের মাংস খেতে দেখলাম।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ জানোয়ারের কোন্ অংশের গোশত পছন্দ করতেন তা যাতে এক নযরে জানা যায় সে উদ্দেশ্যে উপরোল্লিখিত বর্ণনাগুলির সার সংক্ষেপ তুলে ধরলাম। তা হল-

সামনের উরুর গোশত, ঘাড়, রান, কাঁধ, পিঠ, বিশেষ করে ভুনা গোশত।

ভুনা গোশত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোশত খুবই প্রিয় ছিল এটা আপনারা লক্ষ্য করেছেন। তবে সামনের রান ও ঘাড়ের গোশত বেশী পছন্দনীয় ছিল। এ সম্পর্কে অন্য একজন সাহাবীর (রাযিঃ) বর্ণনা দেখুন ঃ

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَهُ يَحُزُّ لِيْ بِهَا مِنْهُ ....

"হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, একদা রাত্রে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (কোন স্থানে) মেহমান ছিলাম। আপ্যায়নকারী একটা বকরী জবাই করল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের রান ভুনা করতে বললেন। অতঃপর একটা ছুরি নিলেন এবং আমার জন্য উক্ত রান থেকে ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন।

–তিরমিযী, মিশকাত

এ হাদীসের দু'টি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। প্রথমতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুনা গোশত পছন্দ করতেন। তাই শুধু শুষ্ক রুটি খাওয়াই সুন্নত নয় রবং স্বচ্ছলতা থাকলে সুস্বাদু এবং উত্তম খানা খাওয়াও সুন্নতের খেলাফ নয় বরং এটাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত সুন্নত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় উভয় অবস্থার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো ছুরি দিয়ে কর্তন করা এবং টুকরা করা সুন্নত পরিপন্থি নয়। অবশ্য কাটা চামচের ব্যবহার একেবারেই পাশ্চাত্য ফ্যাশন। এখন রসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমাদের মহব্বত এবং সম্পর্কই প্রমাণ করবে যে, আমরা কোন পদ্ধতি ও সভ্যতা গ্রহণ করব। একজন প্রকৃত প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের পছন্দনীয় কাজের উপর জীবন উৎসর্গ করাকেই জীবনের স্বার্থকতা মনে করবে। বাহ্যতঃ তা যতই নগণ্য মনে হোক না কেন।

পাখির গোশত

(১) হযরত যাহদাম জারমী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) বলেন ঃ

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ

"আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি।"

(২) হযরত ইব্রাহীম ইবনে ওমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার দাদা সাফিনা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন,

اَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى

"আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে "হুবারার'গোশত খেয়েছি।"

উক্ত হাদীসদ্বয় শামায়েলে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে।

"দুজাজ" মোরগকে বলা হয়। আর হুবারা ছাই রংগের এক প্রকার পাখি যার গর্দান এবং ঠোঁট লম্বা হয়ে থাকে। ফার্সীতে এটাকে 'তাগদীরা' এবং 'চারয' বলা হয়। কোন কোন পন্ডিত ব্যক্তি এটাকে সুরখাবও বলে থাকেন।

(৩) হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমরা "মাররা যাহরান" নামক স্থানে গর্ত থেকে একটা খরগোশ বের করলাম। লোকেরা এটার পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে গেল। তবে আমি শেষ পর্যন্ত এটা ধরেই ফেললাম এবং আবূ তালহার (রাযিঃ) নিকট নিয়ে এলাম। তিনি এটা জবাই করে এর পাখা অথবা রান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি এটা থেকে কিছু খেয়ে ছিলেন।" – বুখারী শরীফঃ কিতাবুল হেবাহ

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোরগ, হুবারা (তাগদীর সুরখাব) এবং খরগোশের গোশত আহার করেছেন। যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোশত খাওয়ার সুযোগ কম হয়েছে তথাপি গোশত খুবই পছন্দ করতেন। বিশেষ করে গর্দান, সামনের দিকের বাজুঁর গোশত এবং রানের গোশত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই প্রিয় ছিল।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে বলেন, "তাঁরা উড়ন্ত পাখীর গোশত ভক্ষণ করবে, যে পাখীর মাংস তাদের দিলে চায়।"

–সূরা ওয়াক্বেয়াহ ঃ আয়াত ঃ ২১

ইউনানী, এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক নির্বিশেষে সকল পদ্ধতির চিকিৎসকগণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একথার উপর একমত যে, মানসিক রোগের ক্ষেত্রে মোরগ এবং পাখীর গোশত অন্য সকল প্রকার গোশতের চেয়ে বেশী উপকারী। প্যারালাইসিসগ্রস্ত রোগীকে জংলী কবুতরের গোশত ঔষধ হিসাবে খাওয়ান হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় খাদ্য সরীদ

'সরীদ' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা বিশেষ প্রিয় খাদ্য ছিল। এ সম্পর্কে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিটকতম সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) -এর বর্ণনা নকল করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি –

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الطَّعَامِ اِلَى الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرِيْدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيْدُ مِنَ الْحَيْسِ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম খাদ্য ছিল "সরীদ"। সরীদ রুটি থেকে তৈরী হয় এবং 'হাইস' থেকেও তৈরী হয়।

– আবূ দাঊদ, মিশকাত শরীফ

এই রেওয়ায়েতে সরীদের দুইটি অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

(১) রুটি থেকে সরীদ অর্থাৎ রুটির টুকরা তরকারীর সুরবা বা পাতলা ডালের মধ্যে এমনভাবে ভিজিয়ে রাখা যেন রুটি খুব ভাল করে ভিজে যায় এবং তা চর্বনের প্রয়োজন না হয়। এই খানা নরম হয় এবং দ্রুত হজম হয়ে যায়।

(২) হাইস থেকে সরীদ অর্থাৎ ছাতুর মধ্যে খেজুর, পনির, ঘি, মিশ্রিত করে সালিদার মত যা তৈরী করা হয়। এ প্রকারে খাদ্য তৈরীর উদ্দেশ্যে হল খানা নরম হওয়া এবং চিবানোর প্রয়োজন না হওয়া আর হজম করতে কষ্ট না হওয়া।

প্রথমত ঃ ছাতু দ্রুত হজম হওয়া ছাড়াও রোগ নিরাময়ের কাজ করে। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে তৈরী করায় অন্য উপকারও রয়েছে। এই প্রকার সরীদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় "হালুয়া" ছিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা প্রিয় খাদ্য লাউ

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ
صَنَعَ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ خُبْزًا شَعِيْرًا وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ
وَقَدِيْدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَى الْقَصْعَةِ فَلَمْ
اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ

"হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ একদা এক দর্জি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খানা খাওয়ার দাওয়াত দেয়। আমিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাই। (আমন্ত্রণকারী) জবের রুটি এবং সুরবা পরিবেশন করল যার মধ্যে লাউ ও শুকনা গোশত ছিল। আমি দেখলাম আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের কিনার থেকে লাউয়ের টুকরা খুঁজে বের করছেন। সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত লাউ সর্বদাই আমার প্রিয় খাদ্য।" –বুখারী, মুসলিম

লাউ কয়েক প্রকার। আমাদের দেশে লাউকি, ঘিয়া লাউ গোল লাউ বা পিলকদু এবং লাল ফুল কদু সচরাচর পাওয়া যায়। প্রথম দুই প্রকার কম বেশী প্রায় একই বৈশিষ্ট্যের। কিন্তু তৃতীয় প্রকার একেবারেই ভিন্ন ধরনের, শুধু নামে মিল রয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাউকী পছন্দ করতেন। যাকে সাদা ফুলের কদু এবং ঘিয়া কদুও বলা হয়। এটা এক উত্তম তরকারী। খেতে খুবই সুস্বাদু এবং কার্যকারিতাও স্বাস্থ্য সম্মত, এবং স্বভাব খুবই ঠান্ডা এবং খুবই দ্রুত হজমকারী, পাকাতেও সুবিধা। এ দিকে চুলার উপর হাড়ি রাখা হল তো ওদিকে পাক হয়ে গেল। লাউয়ের তরকারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই প্রিয় ছিল। –ইবনে মাজা

হালুয়া এবং মধু

আমাদের দেশে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত খাদ্য সমূহের মধ্য হতে বিশেষভাবে খেজুর, মধু, হালুয়া এবং ছাতু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। রোযাদারের জন্য খেজুর দ্বারা ইফতার করা সুন্নত।

ছাতু পান করা এবং খানার সময় দস্তরখানার উপর হালুয়ার ব্যবস্থা থাকা একটা পছন্দনীয় সুন্নত। অবশ্য ছাতু শুধুমাত্র গ্রাম অঞ্চলের পানীয় হিসেবে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে মধু সর্বত্রই এবং সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হালুয়া (মিষ্টি) আমাদের খাদ্যের সঙ্গে, বিশেষ করে কোন মাহফিলের পরে অত্যাবশ্যক একটা অংশ।

এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) এর ইরশাদ লক্ষ্য করুন– তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালুয়া -মিষ্টি এবং মধু পছন্দ করতেন।" – মিশকাত শরীফ

আমরা সস্তা সুন্নত অন্বেষণকারী এবং সহজ সুন্নতের উপর আমলকারীরা এ বিষয়টা একেবারে ভুলে যাই যে, আরবী পরিভাষায় হালুয়া দ্বারা সকল প্রকার মিষ্টান্ন জাতীয় দ্রব্য বুঝায়। এমন কি কখনও কখনও মিষ্টি ফলকেও হালুয়ার মধ্যে শামিল করা হয়। (দ্রষ্টব্য মিশকাতের শরাহ মিরক্বাত)

আমরা উন্নত মানের সুজি এবং দেশী ঘি-এর সঙ্গে ছোট এলাচ, বাদাম, পেস্তা মিলিয়ে যে, সুস্বাদু "সুন্নত" হালুয়া তৈরী করে থাকি খয়রুল কুরুন অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী দুই যুগের লোকেরা সম্ভবত এ ধরনের খাদ্যের কথা চিন্তাও করতে পারেন নাই।

বিশ্বের শান্তির দূত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক প্রকার হালুয়ার পরিচয় আপনারা সরীদের অধ্যায়ে লক্ষ্য করে থাকবেন। যে হালুয়ার উপাদান ছিল ছাতু, খেজুর এবং পনির অথবা দুধ। অন্য এক ধরনের প্রিয় হালুয়া তৈরী হত না-ছানা আটার মধ্যে খেজুরের রস মিশিয়ে।

পীলুর কাল ফল

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ
فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ فَاِنَّهُ اَطْيَبُ فَقِيْلَ اَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ فَقَالَ نَعَمْ - وَهَلْ
مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا رَعَاهَا -

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে থেকে "মার্‌রে যাহরান" এ মধ্যে

"কাবাছ" (পিলুর ফল) টুকাইতেছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কালো কালো ফল বেছে নাও। কারণ এগুলি খুব ভাল হয়ে থাকে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রশ্ন করা হল, আপনি কি বকরী চরিয়েছেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ, এমন কোন নবী নাই যিনি বকরী চরান নাই।" –বুখারী, মুসলিম

হযরত জাবের (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় উপরে যে "মার্‌রে যাহরান" সম্পর্কে বলা হয়েছে তা হলো মক্কার নিকটবর্তী একটা উপত্যকা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থান দিয়ে সাহাবীগণের একটা জামাআত নিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় সাহাবাগণ যখন কিবাস বা পিলু ফল সংগ্রহ করছিলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কালো কালো ফল সংগ্রহ কর। কারণ এগুলি উত্তম।

পিলু গাছ আমাদের দেশেও পাওয়া যায়। যা ঘন ছায়া বিশিষ্ট এবং পাতাগুলি পাতলা পাতলা হয়ে থাকে। গরমের মৌসুমে এগুলির ছায়া একটা নিয়ামত বিশেষ। মূলতঃ আমাদের দেশের পিলু ফল সাধারণত লালাভ হলুদ হয়ে থাকে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো দানাকে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন।

যায়তুন এবং এর তৈল

عَنْ اَبِى اُسَيْدِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهٖ فَاِنَّهٗ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ ـ

"হযরত আবূ উসাইদ আনসারী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যায়তুনের ফল খাও এবং এর তৈল ব্যবহার কর। কারণ এটা একটা বরকতপূর্ণ বৃক্ষ। –মিশকাত, দারেমী, তিরমিযী

যায়তুন একটা ফলদার গাছের নাম এবং ঐ গাছের ফলকেও যায়তুন বলা হয়। ইংরেজীতে এটাকে ওয়ালিভ (OLIVE) বলা হয়। যায়তুনের তেলকে "যাইত" বলা হয়। শামদেশ এবং এর আশপাশে এই গাছ প্রচুর জন্মে থাকে। কোন কোন শীত প্রধান দেশেও এ গাছটি পাওয়া যায়। এর বরকত এবং উপকারিতা এ কারণেও হতে পারে যে আল্লাহ তা'আলা তার সর্বশেষ গ্রন্থের চার স্থানে যায়তুন শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে যায়তুন এর কসম খেয়েছেন। যথা –

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ

যায়তুনের ফল এবং তৈল দু'টিই একান্ত উপকারী এবং ফায়দা দায়ক। হৃৎপিন্ড, মস্তিষ্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্যে শক্তি বর্ধক। মৃদু গরম তাসীর বিশিষ্ট। শরীরে শক্তি জোগায়। এর ফল ও তেল খাদ্য এবং ঔষধ দুটিই। আরব দেশে যায়তুনের তৈল ঘি -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। দস্তরখানার সৌন্দর্য ও জাঁকজমক মনে করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়তুনের তেল এবং ফল উভয়ই ব্যবহার করতে বলতেন। আর এ দুটিকে বরকতময় বলেও আখ্যায়িত করেছেন। যায়তুনের তৈল নাশপতি এবং খাঁটি ঘি অপেক্ষা উত্তম।

সিরকা টক ও ঝালযুক্ত একটি উত্তম সালুন

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ اَهْلَهُ الْاَدَامَ فَقَالُوْا مَا عِنْدَنَا اِلَّا خَلٌّ فَدَعَابِهٖ فَجَعَلَ يَاكُلُ بِهٖ وَيَقُوْلُ نِعْمَ الْاِدْمُ الْخَلُّ نِعْمَ الْاِدْمُ الْخَلُّ ـ

"হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আহলে বাইত (ঘরওয়ালাদের) নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরে কি কোন সালুন বা তরকারী (মাছ, গোশত বা সব্জীর ব্যঞ্জন) আছে? ঘরের লোকেরা বললেন, ঘরে সিরকা ব্যতীত অন্য কিছু নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা চেয়ে নিলেন এবং তা দ্বারা খানা খাওয়া শুরু করলেন। তিনি খানা খেতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, সিরকা কতইনা ভাল তরকারী; সিরকা কতইনা উত্তম তরকারী।" – মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ

লক্ষ্য করার বিষয়, তিনি সর্বোত্তম মানুষ হয়েও কেমন সরল সহজ ছিলেন যে, ঘরে যা কিছু উপস্থিত ছিল কোন লৌকিকতা না করে তা দিয়েই আহার করে ফেললেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিন্দিগীর মধ্যে কতইনা অল্পে তুষ্টি (কানায়াত) এবং ধৈর্য্য ও শুকরিয়া ছিল যে, ভাল খারাপ যা কিছু মিলত তাতেই রাযী ও সন্তুষ্ট থাকতেন। আজ এমন কোন নেতা আছেন যিনি এমন একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে স্বচ্ছল লোকদের ঘরে কোন্ জিনিসের অভাব ছিল? মক্কা ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল। সমস্ত দেশের ব্যবসায়ের পণ্য এবং দূর ও নিকটের সকল ধরনের নিয়ামত সেখানে সহজ লভ্য ছিল। তথাপি তিনি সিরকাকে তরকারীর মত ব্যবহার করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একথা বলে প্রশংসাও করতেন যে, "সিরকা উত্তম তরকারী, "সিরকা উত্তম তরকারী।"

সিরকা মূলতঃ এত উপকারী যা বর্ণনা করে শেষ করার নয়। পেটের হাজারো সমস্যার উত্তম ঔষধ। পাকস্থলীর এবং হজম শক্তির সীমাহীন সহায়ক। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে এক উপাদেয় জিনিস। তবে এটা খানার অতিরিক্ত একটা আইটেম, তরকারী নয়। তথাপি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে তরকারী হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

রাতের খানা

আল্লামা হাফেয ইবনে কায়্যিম (রাযিঃ) দোজাহানের বাদশাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খানা সম্পর্কিত আলোচনার শেষ পর্যায়ে একটা বিশেষ দরকারী এবং উপকারী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সে বিষয়টি তাঁর ভাষায়ই উল্লেখ করা হল।

ইবনে কায়্যিম (রহঃ) বলেন ঃ

وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْعَشَاءِ وَلَوْ بِكَفٍّ مِّنْ تَمْرَةٍ وَيَقُوْلُ تَرْكُ الْعَشَاءِ يُهْرِمُهُ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে খানা খাওয়ার নির্দেশ দিতেন যদিও এক মুষ্টি অথবা তার কম পরিমাণ খেজুর দিয়ে হোক না কেন, এবং তিনি বলতেন রাত্রের খানা ত্যাগ করা বার্ধক্য আনে।"

–যাদুল মাআদঃ খন্ডঃ ২

আজকাল অনেক লোকই অজ্ঞতার কারণে অভ্যাসগত ভাবে রাত্রে খানা খায় না। এবং তারা ধারণা করে এতে বদহজমী থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তাদের স্বীয় অভ্যাস পরিবর্তন করে ফেলা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা কোন সমস্যার কারণে এমন করতে হলে ভিন্ন কথা। তা না হলে রাত্রের খানা যৎসামান্য হলেও খাওয়া চাই।

রাত্রের খানার ব্যাপারে এ বিষয়টিও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের খানা খেয়েই তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়া অথবা ঘুমিয়ে যাওয়াকে নিষেধ করেছেন। সে মতে চল্লিশ কদম হাটা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। অর্থাৎ রাত্রের খানা খাওয়ার পর চল্লিশ কদম হাটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল।

আর এর বিপরীত দুপুরে খানার পর কায়লুলা করা অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্যে শুয়ে আরাম করা সুন্নতে নববী। রাত্রের চল্লিশ কদম হাটা এবং দুপুরের কায়লুলার উপকারিতা প্রত্যেকের নিকট স্বীকৃত।

জবের রুটি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য বিষয়ে আমি আল্লামা হাফেয ইবনে কায়্যিম (রহঃ)-এর বর্ণনা বিস্তারিতভাবে নকল করেছি। এতে যেন কারো এই ধারণা না হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের খানায়ই অভ্যস্থ ছিলেন এবং প্রতিদিনই আল্লাহর নিয়ামত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দস্তর খানায় থাকত। মোটেই নয়। বরং এর একেবারে বিপরীত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য সাদাসিধা বরং অধিকাংশ সময়ই তাকে অনাহারে কাটাতে হত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমার মনে পড়ে না যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় লাগাতার এক সপ্তাহ আমাদের ঘরে চুলা জ্বলেছে।

হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ছালাম (রাযিঃ)-এর নিম্নের রেওয়ায়াতটি লক্ষ্য করুন ঃ

قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ كَسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً فَقَالَ هٰذِهٖ اِدَامُ هٰذِهٖ

"তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম এর তরকারী।"

"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ পর্যায় ক্রমে কয়েক রাত অনাহারে কাটিয়ে দিতেন। রাত্রের খানার জন্য কোন ব্যবস্থা হত না এবং অধিকাংশ সময় রুটি জবের হত।"

সাদামাটা খাদ্য

আপনারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় খাদ্য সম্পর্কে জেনেছেন। এখন দোজাহানের বাদশাহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (দৈনন্দিন) প্রকৃত খাদ্য সম্পর্কে জানুন। তাহলে বুঝতে পারবেন, দোজাহানের বাদশাহ কেমন কষ্টে যিন্দেগী যাপন করতেন এবং পৃথিবীতে ধৈর্য্য, শুকরিয়া অল্পেতুষ্টি ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর কেমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

এ ব্যাপারে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদেম হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর বর্ণনা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجِبُهُ الثُّفَلُ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁড়ির খুরচন অর্থাৎ হাঁড়ির তলায় লেগে থাকা অংশ পছন্দ করতেন।" – তিরমিযী, বায়হাকী, মিশকাত

হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ নামক অন্য এক সাহাবী বর্ণনা করেন ঃ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى ا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ فَوَضَعَ عَلَيْهِ تَمْرَةً فَقَالَ هٰذِهِ إِدَامُ هٰذِهِ

"আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি জবের তৈরী একটা রুটি নিলেন এবং এর উপর খেজুর রেখে বললেন, এটা হল তরকারী, এটা হল তরকারী।"

যে নবীর গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করা যায়না। সেই সর্বোত্তম মানুষটির অবস্থা দেখলেন? হাঁড়ির অবশিষ্ট অংশ (তলানী) আগ্রহ সহকারে খেতেন এবং জবের রুটি ছিল তার দৈনন্দিন খাদ্য। আর জবের রুটির সঙ্গে খেজুরের দানা তরকারী হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং বড় সন্তুষ্ট চিত্তে বলতেন "এটা হল সালুন। এট হল সালুন।"

দুই বেলা গোশত রুটি

হযরত মাসরুক্ব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন,আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর নিকট গমন করলে তিনি আমার জন্য খানা আনলেন আর তিনি বলতে লাগলেন, আমি যখনি তৃপ্তি সহকারে খানা খাই তখনি আমার কান্না এসে যায় সুতরাং আমি কাঁদতে থাকি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরয করলাম কেন?

তিনি বললেন,আমার ঐ সময়ের কথা মনে পড়ে যায় যখন আল্লাহর নবী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন,

وَاللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ

"আমি কছম খেয়ে বলছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিনই দুই বেলা রুটি এবং গোশত তৃপ্তি সহকারে খান নাই।"

–শামায়েলে তিরমিযী

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) যার লকব হল "সিদ্দীকা" বা সত্যবাদিনী তাঁর এ বর্ণনার চেয়ে আর কার বর্ণনা সত্য হতে পারে? যিনি ছিলেন

সত্যবাদী পিতা সিদ্দীকে আকবর-এর সত্যবাদিনী মেয়ে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সঙ্গিনী, অন্তরঙ্গ বন্ধু, নির্জনতা ও লোকালয়ের গোপন তথ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

পক্ষান্তরে তাঁর উম্মতগণের অবস্থা হল, গোশত ছাড়া এক লোকমাও চলে না; সব্জীর মধ্যে গোশত, ডালে গোশত, চাউলে গোশত, সকালেও গোশত এবং সন্ধ্যায়ও গোশত চাই। আর দোজাহানের বাদশাহ এমন জীবন যাপন করেছেন যে, কোন এক দিনও দুই বেলা তৃপ্তি সহকারে গোশত রুটি আহার করেন নাই। তাই তো পরবর্তী খোশহাল যামানায় উম্মুল মুমিনীনের দুই চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত।

দস্তর খানায় গোশত রুটি

عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ إِلاَّ عَلٰى ضَفَفٍ

"হযরত মালেক ইবনে দিনার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যফাফ" ব্যতীত না রুটি তৃপ্তি সহকারে খেয়েছেন না গোশত পেটভরে খেয়েছেন।"

হাদীসের বর্ণনাকারী মালেক (রযিঃ) বলেন, "আমি এক বদরী সাহাবীর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম 'যফাফ' অর্থ কি? তিনি বললেন, মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে খাওয়া। –শামায়েলে তিরমিযী

তরকারীর মধ্যে গোশত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক পছন্দনীয় ছিল। আর গোশতের মধ্যে দস্ত, রান, মাছএবং গর্দানের গোশত তিনি পছন্দ করতেন। কিন্তু দোজাহানের বাদশাহ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তিত্বের তৃপ্তি সহকারে গোশত খাওয়ার সুযোগ হত কই ? উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, গোশত হোক অথবা রুটি হোক যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তৃপ্তি সহকারে খেয়ে থাকেন তবে তা সম্মিলিত খানা তথা সাহাবীগণের মজলিসে বা কোন দাওয়াতের অনুষ্ঠানে খেয়েছেন।

এর দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমতঃ তিনি তাঁর পবিত্র যিন্দেগীর অধিকাংশ সময় নেহায়েত দারিদ্র্য ও দুঃখ কষ্টের সঙ্গে কাটিয়েছেন, অনাহারে দিনাতিপাত করেছেন। আল্লাহ যখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অতিরিক্ত

কিছু দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষের মধ্যে তা বন্টন করে দিয়েছেন। নিজের জন্য পছন্দ করে কিছুই রাখেন নাই। দ্বিতীয়তঃ তিনি কখনই একাকী খাওয়া পছন্দ করতেন না, সর্বদাই অন্যকে খানায় শামিল করতেন এবং সাহাবীদেরকে সর্বদাই এই ত্যাগ ও কুরবানীর শিক্ষা দিতেন।

না চালা আটা

আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোরাক সম্পর্কে হযরত সাহল ইবনে সাআদ (রাযিঃ) থেকে একটা দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীসে তিনি একটা প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন। তাঁর নিকট কেউ প্রশ্ন করল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তোমাদের নিকট চালুনি ছিল কি? তিনি জবাবে বললেন আমাদের নিকট চালুনি ছিল না। অতঃপর প্রশ্ন করা হল তোমরা জবের আটা কি করতে? তিনি জবাবে বললেন,

كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نَثْرِيْهِ نَعْجِنُهُ

"আমরা তাতে ফুঁক দিতাম যা কিছু ভূসি ইত্যাদি উড়ার থাকত উড়ে যেত, অতঃপর আমরা তাতে পানি ছিটিয়ে গুলে নিতাম।"

–শামায়েলে তিরমিযী, বুখারী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিন খাদ্য সম্পর্কে একটু চিন্তা করা উচিত। যিনি উভয় জাহানের বাদশাহ, বিশ্বে শান্তির অগ্রদূত এবং সর্বশেষ নবী ছিলেন তাঁর খাদ্য কি ছিল? মোটা রুটি, সাদাসিধা তরকারী, জবের আটার রুটি, আর সাথে যদি দু'চারটা শুকনা খেজুর অথবা সামান্য কিছু সিরকা মিলত তবে খুবই আনন্দ চিত্তে খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর নিম্নোল্লেখিত হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসটিকে আরো মজবুত করেঃ

مَا اَكَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مُرَقَّقًا وَلَا شَاةً سَمُوْطَةً حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ সময় (ওয়াফাত) পর্যন্ত কখনও পাতলা রুটি এবং ভুনা বকরী আহার করেন নাই।" –বুখারী শরীফ

পানি আর খেজুর খেয়ে জীবন যাপন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্রা স্ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি হযরত ওরওয়া (রাযিঃ)কে বলেন, হে আমার ভাতিজা! নিশ্চয়ই আমি প্রথম তারিখের চাঁদ এবং এভাবে দু'মাসে তিনটি চাঁদ দেখতাম (অর্থাৎ পূর্ণ দু'মাস অতিবাহিত হয়ে যেত) কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আগুন জ্বলত না (অর্থাৎ রান্না হত না)।"

আমি (ওরওয়া) বললাম "হে আমার খালা! আপনারা কিভাবে জীবন কাটাতেন?" তিনি (হযরত আয়েশা) জবাবে বললেন, শুধু মাত্র দু'টি কালো জিনিসের মাধ্যমে অর্থাৎ খেজুর এবং পানির সাহায্যে। তবে অন্য আরও একটি উপায় ছিল, তা হল কিছু আনসার ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী ছিলেন, যাদের কিছু দুধওয়ালা পশু ছিল, তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ঐ জানোয়ারগুলির দুধ পাঠাতেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তা পান করতে দিতেন।" –বুখারী, মুসলিম

"হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) -এর পূর্বের বর্ণনায় আপনারা জেনেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণ না চালা জবের আটার রুটি খেতেন, তবে পরপর দুদিন একটানা জবের রুটি মিলত না এবং একদিন দুবেলা গোশতও জুটত না। এখন আপনারা এই হাদীস শুনলেন যে, দুই মাস ধরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে চুলা জ্বলে নাই। তাদের দিনগুলি শুধু এক ঢোক পানি এবং খেজুরের দানা অথবা কখনও প্রতিবেশী আনসারদের পাঠান দুধে কেটেছে।

আল্লাহ! আল্লাহ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ঘরওয়ালাদের মধ্যে কেমন ধৈর্য্য ছিল! মালে গনীমত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশের ব্যাপারে সমালোচকদের চক্ষু খোলার জন্য এটা একটা বিরাট উপদেশ।

কম খাওয়া ঈমানদারের লক্ষণ

এক পেটুককে দেখে হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ)-এর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বললেন ঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْكَافِرَ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কাফেরগণ সাত অন্ত্র-নাড়ি দিয়ে খায় (অর্থাৎ অধিক খায়।" –তিরমিযী

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি (হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক কাফের মেহমান হল। তাকে একটা বরকীর দুধ দেওয়া হলে সে তা পান করে নিল। অতঃপর আর একটা বকরীর দুধ দেওয়া হলে এটাও পান করে ফেলল। এভাবে তিন, চার এমন কি সাতটি বকরীর দুধ শেষ করে দিল। পরের দিন সে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে এক বকরীর পর দ্বিতীয় বকরীর দুধ দেওয়া হলে সে সবটুকু পান করতে পারল না। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِى أمْعى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِى سَبْعَةِ أمْعَاءٍ

"মু'মিন শুধু মাত্র এক নাড়ি দিয়ে পান করে আর কাফির সাত নাড়ি দিয়ে পান করে (অর্থাৎ মুমিনের তুলনায় কাফির সাতগুণ বেশী পান করে।" –মুয়াত্তা, তিরমিযী, বুখারী

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প খাওয়া মুমিন ও মুসলমানদের আলামত বলে বর্ণণা করেছেন। পক্ষান্তরে পেটুক ও বেশী খাওয়াকে কাফেরের লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। জন্মগতভাবে কারো খোরাক বেশী কারো কম হতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের খোরাক কম হওয়া চাই। এতে শারিরীক সুস্থতা, অন্তরের পবিত্রতা এবং ঈমানী দৃঢ়তা হাসিল হয়। অধিক খাওয়ার কি ক্ষতি? তার ব্যাখ্যা অন্য পৃষ্ঠায় দেখুন।

অন্তরের রোগ-ব্যাধি এবং খানা

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَ اَنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ - اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ

"হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ইরশাদ করেন, মনে রেখো, শরীরের মধ্যে (এমন) একটি মাংসপিন্ড আছে যতক্ষণ তা ঠিক থাকে সমস্ত শরীর ঠিক থাকে আর যখন তা খারাপ হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। খুব মনে রেখো! এটা হল অন্তর। –বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ

অন্তর বা ক্বলব যেমন সকল নেক ও বদ কাজের উৎস এবং এর ইচ্ছা প্রতিটি ভাল ও মন্দের প্রেরণা যোগায়। অনুরূপভাবে রক্তপিন্ডওয়ালা মাংসুল দিলের উপর মানুষের সুস্থতা ও অসুস্থতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এর মধ্যে গন্ডগোল সৃষ্টি হলে মানুষের স্বাস্থ্যের মধ্যেও গন্ডগোল দেখা দেয়। আর সামান্য সময় যদি এর স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় তবে যিন্দিগির সম্পূর্ণ কার্যপ্রণালী উলট পালট হয়ে যায়। কারণ সমস্ত শরীরে রক্ত সরবরাহ এবং শিরা উপশিরার মাধ্যমে শরীরের সকল অংশে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করা উক্ত মাংস পিন্ডের (ক্বলবের) কাজ। রূহানী রোগের চিকিৎসক বিশ্বজাহানের সর্দার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত উপদেশাবলীর মধ্যে ক্বলবের যাবতীয় রোগ-ব্যাধি হতে বেঁচে থাকার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

(১) ক্ষুধার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল এবং কম খাদ্য খাওয়া।

(২) দুপুরের খানার পর সামান্য সময় আরাম করা, যাকে কায়লুলাহ বলা হয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে।

(৩) হারাম খাদ্য খাওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। কেননা এতে রূহানী এবং শারীরিক রোগ ব্যতীত আর কিছুই নাই।

সর্বশেষ কথা হল ঃ

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"জেনে রেখো! আল্লাহর স্মরণে (যিকিরে) অন্তরের প্রশান্তি হাসিল হয়।"

উঠা বসা ও চলাফেরার মৌলনীতি

এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে হাদীসগ্রন্থ সমূহ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি এবং তাঁর বাস্তব জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ হতেও কতিপয় নমুনা পেশ করছি।

এ বিষয়ে অনেক কিছুই লিখার ছিল এবং লিখার প্রয়োজনও আছে বটে। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার ভয়ে মনের ইচ্ছাকে মনেই দাবিয়ে রাখতে হল। অবশ্য হাদীস গ্রন্থসমূহে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উঠা বসা ও চলাফেরা শিরোনামে আলাদা অধ্যায় বিদ্যমান রয়েছে, যা পাঠ করা সকলের জন্যই অত্যাবশ্যকীয়।

আল্লাহ তা'আলাই সকল তৌফিকের মালিক।

কুঞ্চিত হয়ে বসা

عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى ۔ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِلُ الْقُرْفُصَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَخَشِّعَ فِى الْجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ

"হযরত ক্বাইলা বিনতে মাখরামা (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই হাটু উঁচু করে তাতে পবিত্র দুই হস্তদ্বারা পেছিয়ে ধরা অবস্থায় বসে থাকতে দেখিছি। তাঁকে এই বিনীত ভঙ্গীর বসা অবস্থায় দেখে আমি ভয়ে কেঁপে উঠি।"

—আবূ দাউদ, শামায়েলে তিরমিযী

এই পবিত্র হাদীসে এমন কয়টি দিক রয়েছে, যা আমাদেরকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করার আহবান জানাচ্ছে। প্রথমতঃ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসা কত সাদাসিধা ছিল। তিনি হাঁটুদ্বয় খাড়া করে দুই হাত তাতে জড়িয়ে ধরে কুঞ্চিত অবস্থায় বসেছেন। বসার এই ভঙ্গিটি যেমন সহজ ও সাদাসিধা তেমনি আরামদায়কও বটে। দ্বিতীয়তঃ এই ভঙ্গিতে বসার মধ্যে একজন বান্দার বিনয় ও দাসত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এই বসার মধ্যে গর্ব ও অহংকারের কোন সন্দেহও প্রকাশ পায় না। বরং দর্শকের উপর এই ভঙ্গিতে বসার একটা গভীর প্রভাব পড়ে। তৃতীয়তঃ এই সরল ও বিনয়ী বসার ভঙ্গি বর্ণনাকারীণী সহাবিয়্যার উপর এমন প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছিল যে, তিনি ভয়ে কেঁপে উঠেন। সুতরাং আমাদের এরূপ চিন্তা কত ভুল যে, সহজ সরলতার মধ্যে গাম্ভীর্য ও প্রভাব থাকে না এবং সহজ-সরলতার দ্বারা অন্যেরা প্রভাবিত হয় না।

অভিশপ্ত লোকদের বসার ভঙ্গি

عَنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّبِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا جَالِسٌ هٰكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِى الْيُسْرٰى خَلْفَ ظَهْرِىْ وَاتَّكَاْتُ عَلٰى اَلِيَةِ يَدِىْ ۔ قَالَ اَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ۔

সারীদ ইবনে সুওয়াইদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট দিয়ে গমন করেন। তখন আমি এমন অবস্থায় বসা ছিলাম যে, আমার বাম হাত আমার পিঠের উপর ছিল এবং আমার বৃদ্ধাঙ্গুলীর নীচের গোশতের উপর টেক দিয়ে বসা ছিলাম। হুযুর পাক

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এমনভাবে বসেছ যেভাবে সে সব লোক বসত, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে?"

পূর্বে আপনারা রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদাসিধা কিন্তু গাম্ভীর্যপূর্ণ বসার ভঙ্গি কি ছিল তা পাঠ করেছেন। এবং এই সহজ সরল ও বিনয়ী বসার ভঙ্গি দর্শকদের উপর কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করত তাও দেখেছেন। এবারে বসার অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করুন, যাকে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশপ্ত লোকদের বসার ভঙ্গি বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাহ্যতঃ বসার এই ভঙ্গিতে গর্ব, সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়। কিন্তু পরিণামে মানুষ আল্লাহর অভিসম্পাতের শিকার হয়। সুতরাং বসার জন্য আমাদের এমন ভঙ্গি .অবলম্বন করা উচিত যার মধ্যে সরলতা ও গাম্ভীর্য রয়েছে। আর এমন ভঙ্গির বসা থেকে আমাদের দূরে থাকা কর্তব্য যদ্দ্বারা বাহ্যতঃ অহংকার ও মর্যাদার প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এই বসার দ্বারা মানুষ আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে যায়।

চিত হয়ে শোয়া

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَاٰ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে নববীতে এমন অবস্থায় চিত হয়ে শোয়ে থাকতে দেখেছেন যে, তখন তাঁর একটি পা অপর পায়ের উপর রাখা ছিল।" —বুখারী, মুসলিম।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুয়ার সাধারণ নিয়ম ছিল এই যে, তিনি ডান কাতে শুয়ে আরাম করতেন। সাধারণভাবে তাঁর ডান হাত মাথা মুবারকের নীচে থাকত এবং চেহারা আনওয়ার কেবলামুখী থাকত।

উপরোল্লেখিত হাদীসের বর্ণনাকারী একবার মাত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে চিত হয়ে শুইতে দেখেছেন। এটা ছিল একটা অসাধারণ ব্যাপার। হয়ত কাত পরিবর্তন করার জন্য তিনি এমন করে থাকবেন। এই মতের স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, স্বয়ং বর্ণনাকারীই বলছেন যে, তখন তাঁর একটি পা মুবারক অন্যটির উপর রাখা ছিল। আর যদি এভাবেই তিনি শুয়ে থাকেন তবুও একপা অপর পায়ের উপর রাখার দ্বারা এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণ সতর্কতার বিষয়টিই

পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এভাবে পায়ের উপর পা রাখার কারণে শরীরের কাপড় এদিক সেদিক হতে পারে না। কারণ, ঘুম তো ঘুমই। গভীর নিদ্রায় অবচেতন হয়ে যাওয়া একটি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এমতাবস্থায় শরীরের কাপড় এদিক সেদিক হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছুই নয়।

একথা ঠিক যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু পরম সৌভাগ্যশীল সেই ব্যক্তি, যে তার অভ্যাস রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাললামের মহান আদর্শ মোতাবেক গঠন করে দুনিয়া ও আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণ ও সফলতার অধিকারী হয়।

উপুড় হয়ে শোয়া

عَنْ يَعِيْشَ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اَبِيْ بَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلٰى بَطْنِيْ اِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِيْ بِرِجْلِهٖ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا ضَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ - قَالَ فَنَظَرْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"হযরত ইয়াঈশ ইবনে তিখফা (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শোয়া ছিলাম। হঠাৎ আমি অনুভব করলাম যে, কেউ আমাকে তার পা দিয়ে নাড়া দিচ্ছে। অতঃপর বলছে যে, এভাবে উপুড় হয়ে শোয়াকে আল্লাহ অপছন্দ করেন। আমার পিতা বলেন, অতঃপর আমি চোখ খুলে দেখলাম (এ ব্যক্তি আর কেউ নন) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"

আপনি ভেবে দেখেছেন! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপুড় হয়ে শোয়াকে কত বড় ভুল ও ক্ষতিকর হিসাবে উল্লেখ করেছেন! মহান আল্লাহ এভাবে শোয়াকে ঘৃণা করেন।

উপুড় হয়ে শোয়ার দ্বারা মানুষের পাকস্থলী, হজমশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যের উপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব পড়ে। হৃদয়ের স্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাসে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যে কাজটির মধ্যে এত খারাবী আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা পছন্দ করবেন কেন? যারা মানুষের মঙ্গল আর কল্যাণ চান তারা মানুষের জন্য মন্দ ও ক্ষতিকর কোন বিষয়কে কিভাবে মেনে নিতে পারেন?

ডান কাতে শোয়া

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهٖ

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের কেউ যখন ফজরের দু'রাকআত সুন্নত পড়ে ফেলবে, সে যেন ডান কাতে শোয়ে জামাআত শুরু হওয়ার পূর্বে কিছু সময় আরাম করে নেয়।

–আবূ দাউদ, তিরমিযী, রিয়াযুস সালেহীন

এ বিষয়ে স্বয়ং রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস কি ছিল? এই প্রশ্নের জওয়াব হুযূরের সম্মানিতা স্ত্রী উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর ভাষায় শুননঃ

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ

"তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুরাকআত সুন্নত নামায পড়ার পর ডান কাতে শুয়ে কিছু সময় আরাম করতেন।"

উল্লেখিত দু'টি হাদীসে যদিও ফজরের সুন্নতের পর কিছু সময় আরাম করার বিষয়ে হুযূরের মূল্যবান বাণী ও উসওয়ায়ে হাসানা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ের নিয়মও এরূপই ছিল। তিনি সর্বদাই ডান কাতে শোতেন। ডান হাত মাথার নীচে তাকিয়া হিসাবে থাকত এবং তাঁর রুখ হত কেবলামুখী। আমরা একটু পরেই এ সম্পর্কিত অন্যান্য হাদীসের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তুলব। বস্তুতঃ আমাদের জন্যও এভাবে শুয়ার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

মানুষের হৃদযন্ত্র তার বুকের বামপাশে রয়েছে। আজ সকল ডাক্তারগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, হৃদযন্ত্রের উপর কোন প্রকার ভার চাপানো স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই মানুষ যদি বাম দিকে কাত হয়ে শয়ন করে তাহলে অবশ্যই তার হৃদযন্ত্রের উপর চাপ পড়বে। চিন্তা করে দেখুন! আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে যখন বর্তমান এই চিকিৎসা শাস্ত্রের নতুন নতুন গবেষণা ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের কোন নাম নিশানাও ছিল না তখন একজন উম্মী

নবী কত প্রজ্ঞা ও হিকমতপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন। এবং কত সর্বাঙ্গ সুন্দর, সর্বোত্তম একটি আদর্শ জীবন যাপন করে গেছেন।

শুয়ার সঠিক নিয়ম

পূর্ব আলোচনায় আমরা দুটি হাদীস উদ্ধৃত করেছি। যেগুলোর বিষয়বস্তু হল এই যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু' রাকআত সুন্নত নামায পড়ার পর ডান কাতে শুয়ে একটু আরাম করতে বলেছেন। তিনি নিজেও এই আমল করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা হুযূরের সাধারণ ও ব্যাপক হুকুম উদ্ধৃত করছি। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত সায়ীদ ইবনে আবূ উবাইদা (রাযিঃ)। তিনি বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ

অর্থাৎ "তোমারা যখন শুয়ার জন্য বিছানায় যাবে তখন প্রথমে অযু করবে, যেমন নামাযের জন্য অযু কর। অতঃপর ডান কাতে শুয়ে পড়বে।"

–বুখারী শরীফ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত ইয়াঈশ (রাযিঃ) তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়া ছিলাম। হঠাৎ কেউ যেন আমাকে তার পা দিয়ে নাড়া দিল এবং বলল যে, এভাবে শুয়া আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। অতঃপর আমি যখন চোখ তুলে তাকালাম তখন দেখতে পেলাম যে, এই ব্যক্তি হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান কাতে শুতেন এবং তাঁর ডান হাত মাথার নীচে দিয়ে ঘুমাতেন। এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে,

اِنَّهٗ كَانَ اِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهٖ

"হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতেন তখন তাঁর ডান হাত নিজের গাল মুবারকের নীচে রাখতেন।" ঘুমানোর সময়ও তাঁর রুখ কেবলার দিকে থাকত। এতে বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতি হুযূরের পূর্ণ মনোযোগ নিবন্ধ থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। সৌভাগ্য সেই ব্যক্তির যে তার প্রতিটি কাজে সরওয়ারের কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরসণ করে। নিজের

চলাফেরা, নিদ্রা ও জাগরণও হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাসের ছাঁচে গড়ে তোলে। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যেই সার্বিক সফলতা, কল্যাণ ও সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে।

ঘুমানোর সময়

ঘুমানোর ব্যাপারে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি ইশার নামাযের পর খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তেন। কিছু সময় আরাম করার পর খুব তাড়াতাড়িই তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য জেগে যেতেন। তাই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন আজো ইশার নামাযের পর জেগে থাকা এবং গল্পগুজব করাকে পছন্দ করেন না। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا

"হযরত রাসূল মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের আগে ঘুমানো এবং ইশার পর গল্পগুজব করাকে অপছন্দ করতেন।"

এবার ঘুমানো সম্পর্কে হুযূরের বাণী পাঠ করুন।

তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلصُّبْحَةُ تَمْنَعُ الرِّزْقَ

(১) সকালের ঘুম রিযিকের প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়। দিন হল কাজের জন্য আর রাত হল ঘুম ও আরামের জন্য। যদি সারা রাত আরাম করার পরও কেউ নতুন উদ্যমে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর হয়ে উঠার পরিবর্তে ঘুমিয়ে থাকে তাহলে তার রিযিকের দরওয়াজা সে নিজেই বন্ধ করে দেয়।

اِسْتَعِيْنُوْا عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ بِقَيْلُوْلَةِ النَّهَارِ

(২) রাতের একাকিত্বে আল্লাহর স্মরণে নামায পড়ার সুবিধার্থে দিনের বেলা কিছু সময় কায়লুলা (আরাম) করবে। দুপুরে খাওয়ার পর কিছু সময় বিশ্রাম করাকে কায়লুলা বলে। কায়লুলা শুধু স্বাস্থ্যের জন্যই উপকারী নয় বরং রাতের বেলা আল্লাহর স্মরণে জাগ্রত থাকার ঘুমের ঘাটতি পুরণ করতেও সহায়ক হয়।

(৩) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ

"যে ব্যক্তি আসরের পর নিদ্রা গেল সে তার আকল বুদ্ধি ভোঁতা করে ফেলল। সে যেন তার আকল বুদ্ধি ভোঁতা হওয়ার জন্য নিজেকে ব্যতীত আর কাউকে দায়ী না করে।" –জামে সগীর

ঘুমানোর দু'আ

হযরত সায়ীদ ইবনে আবূ উবাইদা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস খানির প্রথম অংশে আপনারা একটু আগেই পড়েছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় যাওয়ার পূর্বে নামাযের ন্যায় অযু করতে এবং ডান কাতে শুতে বলেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন যে, ঘুমানোর আগে তোমারা নিম্নের দু'আটি পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجٰى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আমার জীবন আপনার নিকট হাওয়ালা করছি এবং আমার যাবতীয় বিষয় আপনাকে সোর্পদ করছি। আপনার প্রতি আশা ও ভীতির সাথে আমি আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করছি। আপনি ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল ও ঠিকানা নাই।"

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) ও হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) তাঁরা দু'জনেই রেওয়ায়াত করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমানোর জন্য তাঁর বিছানায় যেতেন তখন এই দুআ পড়তেনঃ

بِسْمِكَ اللّٰهُمَّ اَحْيَا وَ اَمُوْتُ

উপরোক্ত দুআগুলি হল ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করার জন্য। এবার ঘুম থেকে জেগে উঠে যে দু'আ পড়তে হবে সেগুলি লক্ষ্য করুন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমারা যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন এই দুআ পাঠ করবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ عَلَىَّ رُوْحِىْ وَعَافَانِىْ فِىْ جَسَدِىْ وَاَذِنَ لِىْ بِذِكْرِهٖ

"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার আত্মা আমার দেহে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমার দেহকে আরাম দিয়েছেন এবং আমাকে স্বীয় যিকিরের তওফীক দিয়েছেন।" নাসায়ী

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) ও হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) কর্তৃক উপরোল্লেখিত রেওয়ায়াতের শেষ অংশে আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন এই দুআ পাঠ করতেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।"

উপরোক্ত দুআসমূহ মুখস্ত করে নিন। সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আর কে হবে যে ঘুমানোর আগে নিজেই নিজকে খালেক ও মালেকের নিকট সোর্পদ করে দেয়, যিনি চিরন্তন ও চিরঞ্জীব। যার না নিদ্রা আসে আর না তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হন।

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهٖ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهٗ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন সে যেন তার হাত তিন বার ধৌত করার আগে পানির পাত্রে না ডুবায়। কেননা, সে জানে না ঘুমানোর পর তার হাত শরীরের কোন কোন স্থানে গিয়েছে।" –শামায়েলে তিরমিযী

ভেবে দেখেছেন! পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতার প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত তীক্ষ্ণ নযর ছিল! স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি কি পরিমাণ মনোযোগ ছিল! সর্বোপরি মানব জীবনের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি তাঁর কত সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সত্যিই তিনি যদি দিক নির্দেশনা না দিতেন তাহলে মানব জাতি আর কোথায় এবং কার নিকট থেকে দিকে নির্দেশনা পেত! তাই তো ইরশাদ হচ্ছে, ঘুম থেকে জেগে উঠার পর হাত না ধুয়ে কোন পাত্রে হাত দেবে না। অবচেতন ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার হাত কোন কোন জায়গায় গিয়েছে, আর তা পাক রয়েছে না নাপাক হয়ে গেছে তা তো তোমার জানা নাই।

ঘুমানোর আগে ও পরের দুআ সমূহ

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় তশরীফ নিয়ে যেতেন তখন প্রথমে ডান কাতে শুইতেন অতঃপর এই দুআ পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَسلَمتُ نَفسِى اِلَيكَ وَوَجَّهتُ وَجهِى اِلَيكَ وَفَوَّضتُ اَمرِى اِلَيكَ وَاَلجَاءتُ ظَهرِى اِلَيكَ رَغبَةً وَّرَهبَةً اِلَيكَ لَا مَلجَا وَلَا مَنجىٰ مِنكَ اِلَّا اِلَيكَ اٰمَنتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى اَنزَلتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِى اَرسَلتَ

"আয় আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার নিকট সোপর্দ করলাম এবং আমার রুখ আপনার দিকে করলাম। এবং আমার সব কিছু আপনার হাওয়ালা করলাম। আমার যাবতীয় আশা-আকাংখা আপনারই নিকট। আপনার নিকটই আশা করি এবং আপনাকেই ভয় করি। আপনি ব্যতীত কোন আশ্রয় নাই। আপনি ছাড়া মুক্তিও নাই। আমি আপনার প্রেরিত কিতাব ও রাসুল-এর প্রতি ঈমান আনলাম।" –বুখারী শরীফ

হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বর্ণণা করেন,

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে শুইতেন তখন তিনি তাঁর হাত স্বীয় গাল মুবারকের নীচে রাখতেন এবং এই দুআ পড়তেনঃ

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَخَذَ مَضجَعَهُ مِنَ اللَّيلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ بِاسمِكَ اَمُوتُ وَ اَحيَا

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করছি (ঘুমাচ্ছি) এবং আপনার নামেই জীবিত হব।"

এবং তিনি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন এই দুআ পাঠ করতেনঃ

وَاِذَا استَيقَظَ قَالَ اَلحَمدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَحيَانَا بَعدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيهِ النُّشُورُ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মৃত্যুর পর আমাকে জীবন দান করেছেন এবং তাঁর নিকটই আমাদের প্রত্যার্বন করতে হবে।"

অধ্যায় ঃ ১০

রুগ্নের সেবা শুশ্রূষা ও রোগী দেখার আদব

রুগ্নকে দেখতে যাওয়া খেদমতে খালক তথা সৃষ্টির সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। তাই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, তার সেবা-শুশ্রূষা করা ইসলামের চারিত্রিক ও নৈতিক বিধানে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ। আপনারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা নীতির এই অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত তাঁর মহামূল্যবান বাণী পাঠ করবেন যাতে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়াকে আল্লাহকে দেখতে যাওয়া ও তাঁর শুশ্রূষা করার নামান্তর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা যাবতীয় বস্তুগত বিষয়াদি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

আমরা এই অধ্যায়ে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে সব বাণী সন্নিবেশিত করার প্রয়াস পাব যেগুলি এই বিষয়ে কোন না কোনভাবে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। যেমন, রোগী দেখার আহকাম, রোগী-দেখার প্রতিদান, রোগী দেখার আদব, রোগী দেখার দুআ এবং এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হাদীসে নববী।

রোগী দেখতে যাওয়ার হুকুম

এ পর্যায়ে রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং তার সেবা শুশ্রূষা সর্ম্পকে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হল।

(১) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেনঃ

اَطعِمُوا الجَائِعَ وَعُودُوا المَرِيضَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াও এবং রুগ্নের সেবা-শুশ্রূষা কর।" –বুখরী শরীফ

حَقُّ المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ خَمسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ المَرِيضِ ......

(২) "প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে।

(এর মধ্যে দুটি হল) সালামের জওয়াব দেওয়া ও রুগ্নকে দেখতে যাওয়া ও তার সেবা শুশ্রূষা করা। –বুখারী ও মুসলিম শরীফ

(৩) হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেনঃ

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض ....

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রুগ্নকে দেখতে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন।" –বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

(৪) হযরত ছাওবান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع

"যখন কোন মুসলমান ভাই তার কোন মুসলমান রুগ্ন ভাইকে দেখতে যায়, সে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসে ততক্ষণ সে বেহেস্তের বাগানে থাকে।"

–মুসলিম শরীফ ও মিশকাত শরীফ

রোগী দেখতে যাওয়ার প্রতিদান

রুগ্নকে দেখতে যাওয়ার হুকুম এবং এর সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকার পরিণাম কি তা আপনারা পড়েছেন। এবার রোগী দেখতে যাওয়ার সওয়াব ও প্রতিদান কি তা পাঠ করুন।

হযরত আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة

ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة

"যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় কোন রুগ্নকে দেখতে যায় সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করতে থাকে এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বাগান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি সকালে কোন রোগী দেখতে যায় সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করতে থাকে এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বাগান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।"

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ

من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة سبعين خريفا

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করল এবং মুসলমান রুগ্ন ভাইকে দেখতে গেল তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর ফরসখের সমান রাস্তা দূরে সরিয়ে নেওয়া হল।

–আবূ দাউদ

বান্দার শুশ্রূষা আল্লাহর শুশ্রূষা

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন,

يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ـ

قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده

أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ......

"হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে আস নাই। বান্দা আরয করবে, হে আমার রব্ব! আপনি তো বিশ্বজাহানের প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে দেখতে যাব? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি জানতে যে আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল। কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাও নাই। তুমি যদি সেই বান্দাকে দেখতে যেতে তাহলে তুমি সেখানে আমাকে পেতে।"–মুসলিম শরীফ

ভেবে দেখুন! খিদমতে খালকের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রুগ্নকে দেখতে যাওয়ার মর্যাদা কত বড়। আল্লাহ তা'আলা রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়াকে স্বয়ং তাঁকে দেখতে যাওয়ার সমান মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছেন। অথচ তাঁর মহান সত্তা এ সব মানবীয় বিষয়াদি হতে পাক ও পূত পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্যই তাঁর প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে এই ঘোষণা প্রদান করেছেন।

রোগী দেখার ব্যাপারে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রোগী আপন কি পর তার কোন শর্ত নাই। রোগী সে যে কেউ হোক ধনী-গরীব, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত অপরিচিত যে কারো রোগ শয্যায় তার পাশে যাওয়ায় সওয়াব রয়েছে।

রোগী দেখার নিয়ম পদ্ধতি

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض. تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ اَنْ يَّضَعَ اَحَدُكُمْ يَدَهٗ عَلٰى جَبْهَتِهٖ اَوْ عَلٰى يَدِهٖ وَيَسْاَلُهٗ كَيْفَ هُوَ؟

"হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রোগী দেখার উত্তম নিয়ম হল এই যে, তুমি রোগীর কপালে বা তার হাতে তোমার হাত রাখবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, আপনি কেমন আছেন?" –তিরমিযী শরীফ

রোগী দেখার ব্যাপারে প্রায় অনুরূপ একটি রেওয়ায়াত হযরত ইবনুস সুন্নী (রহঃ) হতেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

تَمَامُ الْعِيَادَةِ اَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْمَرِيْضِ وَتَقُوْلُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ وَكَيْفَ اَمْسَيْتَ؟

"রোগী দেখার নিয়ম হল এই যে, তুমি রোগীর শরীরে তোমার হাত রাখবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, আপনার সকাল কেমন কাটল? আপনার সন্ধ্যা কেমন কাটল? (অর্থাৎ আপনি সকালে কেমন ছিলেন এবং সন্ধ্যায় কেমন আছেন?)

উল্লেখিত দুটি হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রোগী দেখার দ্বারা শুধু তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং আসল বিষয় হল রোগীকে সান্ত্বনা ও শান্তি দেওয়া। আমরা কারো দুঃখ দরদ তো নিয়ে নিতে পারি না। তবে সুন্দর কথা ও উত্তম আচরণের দ্বারা তার হৃদয় মন অবশ্যই প্রফুল্ল করতে পারি। এভাবে তার দুঃখ কষ্ট কিছুটা হলেও হালকা করতে পারি।

রোগীর মাথায় বা তার হাতে হাত রাখার দ্বারা একদিকে যেমন তার জ্বরের প্রচন্ডতা অনুভব করা যায়। তেমনি তার প্রতি নিজের ঐকান্তিকতা এবং অকৃত্রিম সহমর্মিতার প্রকাশ ঘটে। আর এটা এমন একটি বিষয় যা একজন রোগীর জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

রোগীর মন খুশী করা

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হুযূরের বাণী শুনুন। তিনি ইরশাদ করেছিলেন ঃ

اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْالَهٗ فِى الْاَجَلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيْضِ

"তুমি যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট যাবে তখন তার দীর্ঘ হায়াত সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করবে। এটা অবশ্য তকদীরকে রদ করতে পারবে না। তবে এতে রোগীর মন অবশ্যই খুশী হবে।" –ইবনে মাজাহ

এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত একটি হাদীসও এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ শয্যায় শায়িত একজন গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে যান। হুযূরের অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি যখন কোন রোগী দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেনঃ

لَا بَاْسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ....

অর্থাৎ "চিন্তার কোন কারণ নাই, ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে।"

–বুখারী শরীফ

এ পর্যায়ে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরো একটি মূল্যবান বাণী শ্রবণ করুন। তিনি ইরশাদ করেছেন যে,

اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا

"তোমরা যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট যাবে তখন তার সাথে ভাল ভাল কথা বলবে।"

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরোক্ত তিনটি হাদীসের প্রতি একবার লক্ষ্য করুন এবং চিন্তা করে দেখুন এগুলি থেকে আপনি কি হেদায়াত লাভ করেন। প্রথমতঃ রোগীর নিকট তার দীর্ঘ জীবন লাভের আলোচনা করবে। তোমাদের কথায় আল্লাহর সিদ্ধান্ত অবশ্যই পাল্টাবেনা। কিন্তু এতে রোগীর চিত্ত অবশ্যই আন্দোলিত ও প্রফুল্ল হবে। দ্বিতীয়তঃ রোগীকে সাহস দাও যে, খোদা চাহেন তো ভয়ের কোন কারণ নাই। তৃতীয়তঃ যখনি কোন রোগীর নিকট যাবে, তার সাথে অতি উত্তম কথা বলবে।

স্বল্প সময়ে রোগী দেখা

এখানে রোগী দেখা সম্পর্কিত হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করা হচ্ছে

اَفْضَلُ الْعِيَادَةِ اَجْرًا سُرْعَةُ الْقِيَامِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ

"সওয়াব ও প্রতিদানের দিক থেকে সর্বোত্তম রোগী দেখা হল রোগীর নিকট স্বল্প সময় অবস্থান করা।"–ফতহুল কবীর

হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরূপ আরো একটি হাদীস পাঠ করুন ঃ

لَا يُطِيلُ الْجُلُوسَ لِانَّ الْاِطَالَةَ عِنْدَ الْمَرِيْضِ مَكْرُوهَةٌ

"কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার নিকট দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করবে না। কেননা, রুগ্ন ব্যক্তির নিকট বেশীক্ষণ অবস্থান করা অপছন্দনীয়।"

মহানবীর (আমার পিতা মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গ হোক) প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী সমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করে দেখুন, এগুলির মধ্যে জ্ঞান, বুদ্ধি, হিকমত, প্রজ্ঞার কি বিশাল ভাণ্ডার সুপ্ত রয়েছে। এমন কোন্ দিকটি আছে যা তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই? বাস্তবিক তিনি ছিলেন খাতামুল মুরসালীন ও রাহমাতুল্লিল আ'লামীন অর্থাৎ আখেরী নবী ও সমগ্র বিশ্বজাহানের জন্য রহমত স্বরূপ।

ইয়াদত বা রোগী দেখা মানবীয় জীবনের বিশাল ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে মানব সেবার একটি অতিক্ষুদ্র অঙ্গ। কিন্তু আমলের দিক থেকে ছোট্ট এবং সওয়াবের দিক থেকে অনেক বড় সওয়াবের এই কাজটির প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কেই তিনি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা রুগ্ন ব্যক্তিদের দেখতে যাও। কেননা, এটা একটি বড় ইবাদত। কিন্তু তার নিকট বেশী সময় অবস্থান করো না। রোগীর নিকট দর্শনার্থীর দীর্ঘসময় অবস্থান করা অপছন্দনীয় কাজ। বাস্তব ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, রোগীর নিকট দর্শনার্থীরা অধিক সময় অবস্থান করলে রোগীর এবং রোগীর পরিজন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের খুবই পেরেশানী হয়।

তৃতীয় দিনে রোগী দেখা

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُوْدُ مَرِيْضًا اِلَّا بَعْدَ الثَّلَاثِ

"হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুগ্ন ব্যক্তিকে অসুস্থ হওয়ার তিন দিন পর দেখতে যেতেন।" সম্ভবতঃ এরূপ একটি রেওয়ায়াতও আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বর আসার তিন দিন পর জ্বরের চিকিৎসা শুরু করতেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে জানা গেল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হওয়ার তিন দিন পর রোগী দেখতে যেতেন। হতে পারে এটা কোন বিশেষ রোগীর ক্ষেত্রে হয়েছে। অথবা এমনও

হতে পারে যে, এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক ব্যস্ততাকালীন সময়ের বিশেষ কোন ঘটনা ছিল। মদীনার জীবনে তিনি দ্বীনি দাওয়াত ও তাবলীগ, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ এবং বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা সাক্ষাতের কারণে অসম্ভব ব্যস্ত থাকতেন। একদিকে পর্যায়ক্রমে কাফেরদের হামলা চলছিল। অপরদিকে সৃষ্টি হচ্ছিল নতুন নতুন সমস্যা। এতদসত্ত্বেও তিনি খেদমতে খালকের স্বভাবগত অভ্যাসে অটল ছিলেন।

"বুখারী শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সম্মানিত সাহাবী হযরত আনাস (রাযিঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, "এক ইয়াহুদী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে গেলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে যান এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ছেলেটি ইসলাম কবূল করে।" সম্ভবতঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান উন্নত চরিত্র এবং একজন অসুস্থ খাদেমকে দেখার ও খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তার বাড়ীতে গমন করাই তাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

রুগ্ন ব্যক্তিকে নামাযের তালক্বীন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا نَائِمٌ اَشْكُوْ مِنْ وَّجَعِ بَطْنِىْ فَقَالَ لِىْ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ اَفِىْ بَطْنِكَ وَجَعٌ ؟ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شِفَاءً

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি পেটের ব্যথায় অসুস্থ ছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ হুরাইরা! তোমার কি পেটে ব্যথা? আমি আরয করলাম, হ্যাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উঠঃ নামায পড়। কেননা, নামাযে শেফা (আরোগ্য) রয়েছে।" –ইবনে মাজাহ

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে মুমিনের মেরাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যম বলেছেন। আল্লাহর বান্দা যখন নামাযের জন্য নিয়ত বাঁধে তখন সে দুনিয়ার সব চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। নামাযে পঠিত দুআসমূহ নামাযের ভাব-ভঙ্গি

উঠা বসা সব কিছু একথাই প্রকাশ ও প্রমাণ করে। উপরোক্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একজন সার্বক্ষণিক মর্যাদাবান সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) কে নামাযের আরো একটি ফায়দার কথা বলেছেন যে, যে কোন ব্যথা বেদনা ও দুঃখ কষ্ট যাই হোক, নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তা দূরীভূত করে দেবেন। কেননা, নামাযে শেফা ও আরোগ্য রয়েছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখে পানি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)-এর ভাষায় রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগী দেখতে যাওয়ার একটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, একবার হযরত সাআদ ইবনে উবাদা (রাযিঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে যান। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ), হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াককাস (রাযিঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। অতঃপরঃ

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَتِهِ فَقَالَ لَقَدْ قَضٰى؟ قَالُوْا لاَ - يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -
فَبَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত সাআদ ইবনে উবাদা (রাযিঃ)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাঁকে নির্জিব অবস্থায় দেখতে পেলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সে কি মারা গেছে? লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! না এখনো মারা যায় নাই। এ কথা শুনার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে থাকেন।

হাদীসের বর্ণনাকারী আরো বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কাঁদতে দেখে উপস্থিত অন্যান্য লোকেরাও কাঁদতে আরম্ভ করে। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা কি জাননা যে, আল্লাহ তা'আলা চোখের পানি ও অন্তরের কষ্টের উপর কোন শাস্তি দেন না? (অতঃপর তিনি জিহবার দিকে ইশারা করে বললেন) তবে এটার কারণে আযাব বা রহম করেন। –বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের এই ঘটনা হতে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরব কান্নায় চোখে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া এবং হৃদয় ব্যথাতুর ও চিন্তাক্লিষ্ট হওয়াকে প্রকৃতিগত একটি বৈধ বিষয় বলে অভিহিত করেছেন। উক্ত ঘটনায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ব্যথাতুর হয়েছেন এবং চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত করেছেন। স্বীয় উম্মতকেও এই দুঃখ প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু জিহবার দিকে ইশারা করে বলেছেন যে, ঐ ছোট্ট অঙ্গটি থেকে বের হওয়া শব্দাবলী যেমন আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যম হয় তেমনি আযাব ও শাস্তির কারণ হয়। ভাল কথা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ডেকে আনে। আর অবৈধ শোক গাঁথা, অভিযোগ ও শোকায়েতের কথা তাঁর আযাবকে উস্কে দেয়।

হিন্দু সমাজে এই প্রথা আছে যে, তারা মৃত্যুর পর মৃতের শিয়রে এবং শবযাত্রার সময় লাশের সাথে নিয়মিত মাতমকারী দল প্রেরণ করে থাকে। তারা এক বিশেষ ভঙ্গিতে শোকগাঁথা গায়। বুকে চাপড়ায়। মাথায় ও মুখে ধুলি বালি মাখে। কোন কোন এলাকায় এই কাজ ভাড়া করা লোক দিয়ে করানো হয়।

এখনো মুর্খ সমাজে মহিলাগণ গলা মিলিয়ে সমস্বরে শোকগাঁথা গায়। চোখে পানি আসুক বা না আসুক, অন্তর কাঁদুক আর নাই কাঁদুক উচ্চ আওয়াজে তারা মাতম অবশ্যই করবে। এ জন্যেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহবাকে আযাব ও দয়ার কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

রোগী দেখার মসনূন দু'আ

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর ভাষায় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দু'আটিও শ্রবণ করুন, যা তিনি রোগী দেখার সময় তাঁর পবিত্র মুখে পাঠ করতেনঃ

كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيْضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ
الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

"যখন তিনি কোন রোগীকে দেখতে যেতেন বা কোন রোগীকে তাঁর খেদমতে নিয়ে আসা হত তখন তিনি এই দুআ পাঠ করতেন। "হে মানুষের রব্ব! তার কষ্ট দূর করে দিন। তাকে আরোগ্য দান করুন। কেননা, আপনি আরোগ্য দানকারী। আপনি ব্যতীত আর কারো নিকট শেফা (আরোগ্য দান করার শক্তি) নাই। আপনি তাকে এমন আরোগ্য দান করুন, যার পর আর কোন রোগ অবশিষ্ট থাকবে না।" –বুখারী শরীফ

রাহমাতুল্লাল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে নিজে তশরীফ নিয়ে যেতেন বা রুগ্ন ব্যক্তিকে তাঁর খেদমতে হাজির করা হত তাহলে তিনি সকল রোগের শেফাদানকারী দয়াময় আল্লাহর দরবারে উপরোক্ত দুআ করতেন। তাঁর এই দুআর দুটি বাক্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন–

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ

অর্থাৎ "হে মানুষের প্রতিপালনকারী রব্ব! আপনি তার কষ্ট দুর করে দিন।" بأس শব্দটির অর্থ– কঠিন, মুসীবত, কষ্ট, দারিদ্র ও যুদ্ধ। (মুফরাদাতুল কুরআন, রাগেব) যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ দুআ করতেন যে, আয় পরওয়ারদিগার! এই রুগ্ন ব্যক্তির সব ধরনের কাঠিণ্য, দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসীবত দূর করে দিন।

اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ

অর্থাৎ হে দয়াময় মাওলা! আরোগ্য আপনারই হাতে। আপনি স্বীয় কুদরতে এই রুগ্ন ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করুন। এমন আরোগ্য দান করুন যার পর আর কোন প্রকার রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট না থাকে। আরবী ভাষায় সর্বপ্রকার দৈহিক রোগ-ব্যাধিকেই "সাকাম" বলা হয়। –মুফারাদাতুল কুরআন, রাগেব

রোগী দেখার আরেকটি দুআ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا فَقَالَ اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ (سَبْعًا عُوْفِيَ اِنْ لَّمْ يَكُنْ حَضَرَ اَجَلُهُ)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে রেওয়ায়াত করেন যে, যে ব্যক্তি কোন রুগ্নকে দেখতে যাবে সে যেন সাতবার এই দুআটি পাঠ করে–

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থাৎ "আমি সুউচ্চ আরশের সুমহান অধিপতি (রব্ব)-এর নিকট আপনার রোগমুক্তি কামনা করছি। তিনি যেন আপনাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেন।" যদি তার মৃত্যুর সময় এসে না গিয়ে থাকে তবে সে (এই দুআর বরকতে) আরোগ্য লাভ করবে। –মুসতাদরাকে হাকেম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী শরীফ

দু'আটি একবার পাঠ করে নিন। এটা এমন কোন লম্বা দুআ নয় যা মুখস্ত করে নেওয়া খুব কঠিন হবে। তাই আপনিও এটি মুখস্ত করে নিন। মনে রাখবেন! দুআর অর্থ উপায় উপকরণ অবলম্বন না করা এবং ওষুধ পত্র ও চিকিৎসা থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার নাম নয়। বরং দুআর অর্থ হল–একমাত্র আরোগ্য দানকারী মহান পরওয়ারদিগারের দরবারে রোগীর রোগ মুক্তির জন্য একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে বিনীত প্রার্থনা করা। এ জন্যেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআটি সাত বার পড়তে বলেছেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যদি তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে না এসে থাকে তাহলে রুগ্ন ব্যক্তি অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে। তার শেষ মুহূর্ত এসে গেছে কিনা তা যেহেতু কারো জানা নাই সুতরাং তার রোগ মুক্তি কামনা করতে থাকাই উচিত।

রুগ্নকে দেখতে গিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুআ

عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ لِيْ يَا سَلْمَانُ شَفَى اللّٰهُ سَقَمَكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَعَافَاكَ فِيْ دِيْنِكَ وَجِسْمِكَ اِلٰى مُدَّةِ اَجَلِكَ

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) তাঁর ব্যক্তিগত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন,

"আমি রুগ্ন অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে আসেন এবং এই দুআ করেন, আল্লাহ তোমার রোগ ভাল করে দিন, তোমার গোনাহ মাফ করে দিন এবং তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার দ্বীন ও দেহকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন।"

চিন্তা করে দেখুন! কত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ দুআ। কেন হবে না। এটা যে আল্লাহর নবীর পবিত্র মুখ নিসৃত দুআ। তাই তো এতে দুনিয়া ও আখেরাত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, দেহ ও আত্মা সবকিছুর জন্যই কল্যাণের দুআ সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে রয়েছেঃ

(এক) মহান মুক্তিদাতা আল্লাহ তোমার রোগ ভাল করে দিন এবং তোমাকে সুস্থতা দান করুন।

(দুই) ক্ষমাশীল আল্লাহ তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন। তিনি যদি মেহেরবানী করে ক্ষমা না করেন তাহলে দুনিয়াতে অপদস্থতা এবং আখেরাতে লাঞ্ছণা ছাড়া আর কি পাব?

(তিন) আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রুগ্ন ব্যক্তিকে আত্মিক এবং দৈহিক উভয় দিক থেকেই শান্তি দান করুন। আর যতদিন হায়াত থাকবে ততদিন সুস্থ আরামদায়ক ও নিরাপদ জীবন দান করুন।

রুগ্ন ব্যক্তির নিকট দু'আ কামনা

হযরত আনাস (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

عُوْدُوا الْمَرْضٰى وَمُرُوْهُمْ فَلْيَدْعُوا اللّٰهَ لَكُمْ فَاِنَّ دَعْوَةَ الْمَرِيْضِ مُسْتَجَابَةٌ وَذَنْبُهٗ مَغْفُوْرٌ ـ

"তোমরা রুগ্ন ব্যক্তিদের দেখতে যাবে এবং তাদের নিকট দুআর আবেদন করবে। তারা যেন তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করে। কেননা, রুগ্ন ব্যক্তির দুআ অবশ্যই কবূল হয়ে থাকে এবং তাদের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। –আত-তারগীব ওয়াত তারহীব

এ সম্পর্কে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাযিঃ)-এর বরাতেও একটি হাদীস শ্রবণ করুন।

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ يَدْعُوْكَ فَاِنَّ دُعَاءَهٗ كَدُعَاءِ الْمَلٰئِكَةِ ـ

"হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট যাবে তখন তার নিকট আবদার করে বলবে সে যেন তোমাদের জন্য দুআ করে। কেননা, তার দুআ ফেরেশতাদের দুআর মত (মকবূল) হয়ে থাকে।" –ইবনে মাজাহ, মিশকাত শরীফ

আল্লাহ আকবার! কোথায় কল্পনাপূজারীদের এই ধারনা যে রোগ-ব্যধি হওয়া একটি আযাব ও গুনাহের শাস্তি। আর কোথায় সত্যবাদী মহান নবীর এই শিক্ষা যে, রুগ্ন ব্যক্তির উপর আল্লাহর খাছ রহমত বর্ষিত হয়। তার দুআ বিশেষভাবে কবূল হয়ে থাকে। এটা কতবড় সুসংবাদ যে, রুগ্ন ব্যক্তির গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং তার দুআ মকবূল হয়। শুধু তাই নয় বরং তাদের দুআ ফেরেশতাদের দুআর সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে তখন তার নিকট নিজের জন্য দুআর দরখাস্ত করবে।

এতে বুঝা যায়, অসুখে পতিত হওয়ার কারণে বান্দা যেন ফেরেশতাদের ন্যায় দুআ কবূল হওয়ার মাকাম ও মর্যাদা হাসিল করে এবং স্বীয় মাওলা পাকের অতি নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

অন্তিম মুহূর্তে তালক্বীন

যে কারো দুনিয়াতে আসার পর একদিন তাকে এখান থেকে বিদায় নিতেই হবে। মৃত্যুর স্বাদ তাকে চাকতেই হবে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার এই অন্তিম মুহূর্তটি কেমনে অতিক্রান্ত হবে? এ সম্পর্কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সম্মানিত সাহাবী হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ)-এর মুখ থেকে শুনুন। তিনি বলেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

"তোমরা মৃত্যু পথযাত্রী লোকদের (তার অন্তিম মুহূর্তে) কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তালক্বীন কর।" –মুসলিম শরীফ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপর এক সাহাবী হযরত মুআয (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসও উপরোক্ত মুবারক ইরশাদের সমর্থন করে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যার জীবনের শেষ কালাম হবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" –মুসতাদরাক, আবূ দাউদ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গ হোক) এই পবিত্র বাণীর আছর হল এই যে, আজ আমাদের সমাজে সুপ্রচলিত নিয়ম এই যে, কোন রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষাকারী যখন অনুভব করে যে, এখন তার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে তখন তার মৃত্যু কষ্টের অবস্থায় তাকে কালিমায়ে তাইয়্যেবার তালক্বীন করে। তালক্বীনের অর্থ হল তাকে বলা হবে যে, কালামা তাইয়্যেবা "লা-ইলাহা ইল্লাহ" পাঠ কর। তবে এ ক্ষেত্রে সুন্নত হল এই যে, পাশে বসা লোকেরা নিজেরাই জোরে জোরে কালিমা তাইয়্যেবা পাঠ করতে থাকবে। বস্তুতঃ এর মধ্যে অনেক বড় হিকমত নিহিত রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিকে কালিমা পড়তে বলা হয় তবে সে হয়তো পড়তে সক্ষম নাও হতে পারে। কারন এই কঠিন অবস্থায় তার জিহবার নড়াচড়া করার শক্তি আছে কিনা তার হুশ ও অনুভূতি ঠিক আছে কিনা তাতো জানার কোন উপায় নাই। সর্বোপরি খোদা না করুন মৃত্যু যাতনায় তার মস্তিষ্কও তো বিকৃত হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় সে হয়তো কালিমা পড়তে অস্বীকারও করে বসতে পারে। সুতরাং পাশে অবস্থানরত শুশ্রূষাকারীগণ কালিমা পাঠ করতে থাকবে। আর রোগীর নিজেরই উপলব্ধি জাগ্রত হবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তিম মুহূর্ত

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীবের ওয়াফাতকালীন মুহূর্তগুলি কিভাবে কেটেছে? এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় তাঁর পবিত্র মুখে কি কি কথা উচ্চারিত হয়েছে?

এই প্রশ্নের জওয়াব হযরতের অন্তিম মুহূর্তে শুশ্রূষাকারীণী তাঁর পবিত্রা স্ত্রী মুসলিম জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর ভাষায় শুনুন। তিনি বলেনঃ

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

"আমি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তাঁর পাশে রক্ষিত একটি পানির পাত্রে বার বার হাত ভিজিয়ে এনে স্বীয় চেহারা মুবারক মছেহ করতে দেখেছি। এ সময় তিনি বলছিলেন "আয় আল্লাহ! আমাকে মৃত্যুর কঠিন যাতনায় সাহায্য করুন।" –তিরমিযী শরীফ

এতদ্ব্যতীত বুখারী ও মুসলিম শরীফে উক্ত হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত এইরূপ রেওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, অন্তিম মুহূর্তে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন তখন তিনি বলছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে আমার মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে নিয়ে যান।

–বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

আল্লাহ! আল্লাহ! জীবনের অন্তিম মুর্হূতটি কত কঠিণ ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের জীবনেও সেই চরম সন্ধিক্ষণটি অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময় তিনি এমন প্রচন্ড গরম অনুভব করেন, যার ফলে বারবার তিনি তাঁর হাত ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়েছেন ও ভিজা হাতে চেহারা মুবারক মুছেছেন। এ কঠিন অবস্থাতেও তিনি তাঁর পবিত্র মুখে আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমত কামনা করছেন। মহান বন্ধুর সাথে মিলনের ঐকান্তিক আকাংখা ব্যক্ত করছেন।

অধ্যায় ঃ ১১

পরিশিষ্ট

পবিত্র কুরআনে ঔষধ পত্র ও খাদ্য দ্রব্যের আলোচনা

হাদীস শরীফে উল্লেখিত রোগ-ব্যাধি

হাদীস শরীফে উল্লেখিত ঔষধাবলী

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্যদ্রব্য

খাদ্য ও ঔষধের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

গ্রন্থপঞ্জি

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ঔষধপত্র ও খাদ্যদ্রব্য

আমরা যে সব খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করি বা চিকিৎসকগণ যে সব ঔষধপত্র দাওয়া ও প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবস্থা করেন। সেই ঔষধ বনজ লতা-পাতা ও গাছ গাছড়ার হোক বা সে গুলির সম্পর্ক খনিজ পদার্থের সাথে হোক, এবং এই সব ঔষধের ব্যবহারকারী প্রাচীন যুগের চিকিৎসক হোক বা আধুনিক যুগের চিকিৎসকই হোক, আমরা এখানে বর্ণমালার ক্রমানুসারে অতি সংক্ষিপ্তভাবে সেই সব জিনিসগুলির আলোচনা উপস্থাপন করছি। যাতে এই বিষয় বস্তুর উপর যারা কাজ করতে আগ্রহী, তাদের জন্য গবেষণা ও অনুসন্ধানের একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়।

আনার

আল্লাহর তা'আলা সূরা আর-রাহমানে স্বীয় নিআমত সমূহের বর্ণনা প্রসংগে ইরশাদ করেছেনঃ

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ

"তথায় আছে ফলমূল খর্জুরবৃক্ষ ও আনার।"

—সূরা আর-রাহমান আয়াত ঃ ৬৮

আঞ্জীর

আরবী ভাষায় আঞ্জীরকে বলা হয় "ত্বীন"। পবিত্র কুরআনের ত্রিশতম পারার একটি সূরার নামই হয়েছে "ত্বীন"। এতে আল্লাহ তা'আলা "ত্বীন" এর কসম খেয়েছেন। অর্থাৎ একটা প্রমাণ ও দলীল হিসাবে এর উল্লেখ করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ....

"শপথ 'ত্বীন' ও যাইতুনের।" —সূরা ত্বীনঃ আয়াত ঃ ১

আঙ্গুর

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আবাসায় কতিপয় তরকারী ও ফলমূলের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন ঃ

فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا .... مَتَاعًا لَّكُمْ ....

"অতঃপর আমি তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, তোমাদের এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।" —সূরা আবাসা ঃ আয়াত ঃ ২৭-৩২

সূরা নাহল-এ আঙ্গুরকে "উত্তম রিযিক" বলা হয়েছে।

—সূরা নাহল ঃ আয়াত ঃ ১৬

সূরা বনী ইসরাঈলেও আঙ্গুরের বাগান সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। মক্কার কাফেরগণ মুজিযা ও নবুওয়াতের দলীল স্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এগুলি দাবী করেল আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত সমূহ নাযিল করেন। —সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ঃ ৯১

এতদ্ব্যতীত কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরাতেও আঙ্গুরের আলোচনা করা হয়েছে।

মান্না ও সালওয়া

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরাতে মান্না ও সালওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। বনী ইসরাঈলগণ 'ত্বীহ' ময়দানে দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে উদভ্রান্ত অবস্থায় চল্লিশ বছর ঘোরার সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি এই মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছিলেন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى

"আমি তাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছিলাম।" সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ৫৭, সূরা আরাফঃ আয়াতঃ ১৬০, সূরা ত্বাহা, আয়াতঃ ৮০

যাঞ্জাবীল (শুকনা আদা)

আল্লাহ তা'আলা সূরা দাহার– এ জান্নাতবাসীদেরকে যে সকল পানীয় দেওয়া হবে সেগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে যাঞ্জাবীল কে একটি অনন্য নিআমত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

"তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে যানজাবীল মিশ্রিত পানপাত্র।"

–সূরা দাহারঃ আয়াতঃ ১৭

যাইতুন

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় যাইতুন ও এর তৈল এর উল্লেখ হয়েছে। সূরা ত্বীনে যাইতুন-এর কসম খেয়ে বলা হয়েছে–কসম ত্বীন ও যাইতুনের। সূরা আবাসায় মানুষের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দ্রব্যের আলোচনায় যাইতুন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَلْيَنظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ .... وَزَيْتُونًا وَّ نَخْلًا

"মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি তাদের জন্য উৎপন্ন করেছি যাইতুন ও খর্জুর।" –সূরা আবাসাঃ আয়াতঃ ২৪-২৮

সূরা নূর-এ যাইতুন বৃক্ষকে বলা হয়েছে "শাজারাতিম মুবারাকা" বা বরকতময় বৃক্ষ। –সূরা নূরঃ আয়াতঃ ২৫

এছাড়া সূরা আবাসা, সূরা নাহল এবং সূরা আনআমেও যাইতুনের আলোচনা এসেছে।

শহদ বা মধু

সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ কুরআন মজীদে মধু এবং মধুমক্ষিকার কথাও কয়েক বার উল্লেখিত হয়েছে। বরং পবিত্র কুরআনের চৌদ্দ পারার ১৬টি রুকু সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র সূরার নামই 'সূরা নাহল' বা মধুমক্ষিকার সূরা নামে নামকরণ করা

হয়েছে। এই সূরার ৮৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, এবং আপনার প্রতিপালক মধুমক্ষিকার প্রতি এই আদেশ দিলেন যে, পর্বতগাত্রে এবং উঁচু বৃক্ষের ডালে তোমারা গৃহ তৈরী কর।" –সূরা নাহলঃ আয়াতঃ ৬৮

অতঃপর মধু সম্পর্কে ইরশাদ করেনঃ

يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

"আল্লাহ তা'আলা এই মধুমক্ষিকার পেট থেকে এমন পানীয় বের করেন যার রঙ হয় বিভিন্ন। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার।"

–সূরা নাহলঃ আয়াতঃ ৬৯

আল্লাহ তা'আলা সূরা মুহাম্মদ-এ জান্নাতে মধুর নহরের সুসংবাদ দান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى

"জান্নাতে স্বচ্ছ মধুর নহর প্রবাহিত হবে।"

– সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ঃ ১৫-৪৭

কিত্‌র বা তামা

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর প্রতি স্বীয় নিআমত সমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তামার উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন যে,

وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ

"আমি সূলাইমানের জন্য তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম।"

–সূরা সাবাঃ আয়াত ঃ ১২

হাদীদ বা লোহা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে লোহাকেও তাঁর এক বিশেষ নিআমত এবং মানব জাতির জন্য বিপুল উপকারী বস্তু হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

কুরআনের তেইশ পারায় "সূরা হাদীদ" নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা বিদ্যমান রয়েছে। সূরা সাবায় হযরত দাউদ (আঃ)-এর মর্যাদার আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ

"আমি তাঁর জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম।" –সূরা সাবাঃ আয়াত ১০

সূরা হাদীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

"আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি, যাতে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিদ উপকার রয়েছে।"–সূরা হাদীদঃ আয়াত ঃ ২৫-৫৭

কাফুর

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে যে সকল পানীয় নিআমত হিসাবে দান করবেন সেগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, এর মধ্যে এক প্রকার পানীয় থাকবে কাফুর মিশ্রিত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا

"নিশ্চয়ই সৎকর্মশীল বান্দাগণ জান্নাতে পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্রে।" –সুরা দাহরঃ আয়াত ঃ ৫

দুধ

মহান পরওয়ারদিগারের আখেরী গ্রন্থে জান্নাতের যে সব নিআমতের আলোচনা করা হয়েছে এর মধ্যে একটি নিআমত হল দুধের নহর। আল্লাহ তা'আল্লা ইরশাদ করেছেনঃ

وَ اَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ

"বেহেশতে দুধের এমন নহর প্রবাহিত হবে যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হবে না।" সূরা মুহাম্মদঃ আয়াত ঃ ১৫

অপর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা দুধকে স্বচ্ছ নির্মল ও সুস্বাদু বস্তু হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন ঃ

لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"স্বচ্ছ নির্মল নির্ভেজাল ও খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও উপাদেয়।"
–সুরা নাহলঃ আয়াতঃ ৬৬

পাখির গোশত

সূরা ওয়াকেয়াতে বেহেশতবাসীদের অতি প্রিয় ও আকর্ষণীয় খাদ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ইরশাদে খোদাওন্দী হচ্ছেঃ

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

"সেখানে রয়েছে পাখির গোশত যা বেহেশতবাসীদের জন্য অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য।' '–সূরা ওয়াকেয়া ঃ আয়াত ঃ ২১

মাছ

আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতের-এ সমুদ্র থেকে আহরিত বিভিন্ন প্রকার নিআমতের আলোচনা করেছেন। এই হৃদয়গ্রাহী আলোচনায় নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا

"আর তোমরা প্রত্যেক সমুদ্র হতে তাজা গোশত আহার কর।"

–সূরা ফাতেরঃ আয়াতঃ ১২

একথা স্পষ্ট যে, সমুদ্র থেকে আহরিত তাজা গোশত মাছেরই হয়ে থাকে। এটাকেই আল্লাহ তা'আলা আয়াতে তাঁর বিশেষ নিআমত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

মোতি, প্রবাল ও ইয়াকূত

পবিত্র কুরআনের সাতাশ পারায় সূরা আর-রাহমান আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন নিআমতের আলোচনায় ভরপুর।

প্রতিটি নিআমত উল্লেখ করার পর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে,

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

অর্থাৎ "অতঃপর তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ নিআমত অস্বীকার করবে?"

এই মুবারক সূরাতেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে মোতি, প্রবাল ও ইয়াকূতের হৃদয়গ্রাহী আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

দেখুন সূরা আর-রাহমান ঃ আয়াত ঃ ২২ ও ৫৮

খেজুর

কুরআনুল করীমের সূরা আবাসায় বারবার উল্লেখিত শাক সজি ফল-মূল ও বৃক্ষাদির আলোচনা এসেছে। অন্যান্য নিআমতসমূহের সাথে এখানে খেজুরের কথাও উত্থাপিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُونًا وَّنَخْلًا

"আমি জমিনে উৎপন্ন করেছি শস্য আঙ্গুর শাক-সজি, যাইতুন ও খেজুর বৃক্ষ।" –সূরা আবাসাঃ আয়াতঃ ২৭

আল্লাহ তা'আরা সূরা নাহলে খেজুর ও আঙ্গুরের বরকতের কথা নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেনঃ

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ...."

অর্থাৎ "খেজুর ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা সাকার ও উত্তম খাদ্য তৈরী কর। নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।"

–সূরা নাহলঃ আয়াতঃ ৬৭

এতদ্ব্যতীত সূরা আনআমের নিরান্নবই নম্বর এবং সূরা মরিয়মের তেইশ নম্বর আয়াতেও খেজুর এবং খেজুরের উপকারিতা আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের প্রথম পারায় সে সব শাক সজির কথা বলা হয়েছে যেগুলি মান্না ও সালওয়ার পরিবর্তে পাওয়ার জন্য বনী ইসরাঈল আবদার করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের আকাংখা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন বটে কিন্তু নিআমতে ইলাহীর পরিবর্তে তাদের এই সব বস্তুর জন্য আবদার করাটা পছন্দ করেন নাই।

কুরআনের ভাষায় বনী ইসরাইল আবদার করেছিল ঃ

فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ....

"হে মূসা! আমাদের জন্য আপনার রব্বের নিকট বলুন, তিনি যেন আমাদেরকে এমন বস্তু সামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়–যেমন তরকারী, কাঁকড়ী, গম, মসুর ডাল পেঁয়াজ ইত্যাদি।"

–সূরা বাকারা ঃ আয়াত ঃ ৬১

হাদীস শরীফে উল্লেখিত রোগ-ব্যাধি

পরিশিষ্টের এই অংশে আমরা সে সব রোগ-ব্যাধির তালিকা পেশ করছি, যেগুলির আলোচনা ও চিকিৎসা বক্ষমান গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। রোগের উপসর্গ, নিদর্শন, কারণ ও চিকিৎসা ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায় দেখুন।

হাদীস শরীফে উল্লেখিত প্রতিষেধক

এখানে আমরা সে সব ঔষধ ও প্রতিষেধকের তালিকা উপস্থাপন করছি যেগুলির বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

প্রতিষেধক	রোগ	পৃষ্ঠা
১. কুস্বা	চোখের ঔষধ	৯৫
২. মুসববর	চেহারার লাবণ্য ও কমনীয়তার জন্য	৮৮
৩. বিহি দানা	হৃদয়ের প্রশান্তি ও হার্টের শক্তির জন্য	১০৫
৪. তালবীনা (যবের দ্বারা প্রস্তুত)	পেট ব্যথায় হালকা খাদ্য	১০০
৫. যব	পেট ব্যথায় হালকা খাদ্য	১০০
৬. মেহদী	মাথা ব্যথা, ফোঁড়া দুম্বল ও কাটা ঘায়	৮১
৭. ওয়ারস	নিউমোনিয়া	১০৪
৮. যারীরাহ (চিরতা)	ফোঁড়ার জন্য	১০২
৯. ছাই	যখমের জন্য	১০৩
১০. যাইতুন	নিউমোনিয়া	১০৪
১১. সুরমা	চোখের দৃষ্টি শক্তির জন্য	৮৯
১২. সোনামুখি	যে কোন রোগের জন্য উত্তম বিরোচক	৮৫
১৩. সানুত	সকল রোগে ব্যবহারযোগ্য	৮৭
১৪. শিংগা	রক্তের আধিক্যের জন্য	৯৯
১৫. শিবরম	জুলাব	৮২
১৬. মধু	সর্বরোগের শেফাদানকারী, পেটের পীড়ায় প্রতি মাসে তিন বার সেবনে বিশেষ উপকারী।	৮৩
১৭. কুসত বা গোঠ	গলগন্ড ও নিউমোনিয়ার জন্য	৯০
১৮. আজওয়া খেজুর	হৃদরোগ ও বিষের মহৌষধ	১০৬
১৯. আগর কাঠ	গলগন্ডের প্রতিষেধক	৯০

প্রতিষেধক	রোগ	পৃষ্ঠা
২০. কৃষ্ণ জিরা	সর্ব রোগের ঔষধ	৯২
২১. গাভীর দুধ	সুস্বাস্থ্যের জন্য	৩০
২২. লবণ	বিষাক্ত পোকা মাকড়ের কামড়ের ঔষধ স্বরূপ	৯৭
২৩. ঠান্ডাপানি	জ্বরের জন্য	৯৪
২৪. মলম পট্টি	যখম	১০৩
২৫. বরনী খেজুর	সর্বরোগের প্রতিষেধক	১০৭
২৬. দুম্বার চাকী	গৃধ্রশী বা সাইটিকার জন্য	৯৩
২৭. চাটাই	রক্ত বন্ধের জন্য	১০৩
২৮. আনজীর	অর্শ ও ছোট সন্ধির ব্যথার প্রতিষেধক	১০৮

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদ্য তালিকা

চালাবিহীন আটা	সিরকা (তরকারী হিসাবে)
পিলো	মধু
তরমুজ	পিলো বৃক্ষের পাকাফল
সারীদ	লাউ
সাফাল	সাধারণ খেজুর
যবের রুটি	আজওয়া খেজুর
হুবারা ঃ এক প্রকার পাখি	কাঁকড়ী (বরণী)
হালুয়া	গোশত ঃ ছাগল, মুরগী, পাখি
রুটি	গর্দান, ডানা, কাঁধের অংশ, ভুনা গোশত,
দুধ	মাছ, মাখন, লবণ
যাইতুন ও যাইতুনের তৈল	ছাফারজাল বিহি দানা

গ্রন্থপঞ্জী

অধম লেখক 'তিব্বে নববী' সংকলন করতে গিয়ে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি। আমি এই গ্রন্থগুলির সম্মানিত লেখক, সংকলক ও প্রকাশকদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁদের সকলকে উত্তম বদলা দিন।

(১) মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাক্বাইকুত তাবীল ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ নসফী, মৃত্যুঃ ৭০১ হিজরী

(২) মুফরাদাতুল কুরআন ঃ আল্লামা রাগেব ইস্পহানী (রহঃ), মৃত্যু ৫০২ হিজরী

(৩) বুলূগুল মুরাম ঃ আল্লামা হাফেয ইবনে হজর আসক্বালানী (রহঃ) মৃত্যু ৮৫৩ হিজরী

(৪) তফসীরে মাজেদী ঃ মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী

(৫) বুখারী শরীফ ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ), মৃত্যু ২৫৬ হিজরী

(৬) আল জামে-উস সহীহ ঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ), মৃত্যু ২৬১ হিজরী

(৭) মিশকাত শরীফ ঃ আবূ মুহাম্মদ হোসাইন বগভী (রহঃ), মৃত্যু ৫১৬ হিজরী

(৮) মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (রহঃ) ঃ মৃত্যু ১৭৯হিজরী

(৯) সুনান আবূ দাঊদ (রহঃ) ঃ মৃত্যু ২৭৫ হিজরী

(১০) সূনান ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ (রহঃ) ঃ মৃত্যু ২৭৩ হিজরী

(১১) সুনান ইমাম আহমদ নাসায়ী (রহঃ) ঃ মৃত্যু ৩০৬ হিজরী

(১২) শামায়েলে তিরমিযী ঃ ইমাম মুহাম্মদ তিরমিযী (রহঃ) মৃত্যু ৩৭৯ হিজরী

(১৩) রিয়াযুস সালেহীন ঃ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে শরফুদ্দীন নববী (রহঃ) মৃত্যু ৬৭১ হিজরী

(১৪) মুসতাদরাক ঃ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ হাকেম নিশাপুরী, মৃত্যু ৪০৫ হিজরী

(১৫) তালখীসুল মুসতাদরাক ঃ আল্লামা শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ, মৃত্যু ২৪৮ হিজরী

(১৬) ওয়াসাইলুল উসূল ইলা শামায়িলির রসূল ঃ মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল, প্রকাশকাল ১৩৮০ হিজরী, মিসর

(১৭) শামায়েলে রসূল ঃ অনুবাদ ঃ মিয়া মুহাম্মদ সিদ্দীকী, লাহোর

(১৮) তাফহীমুল কুরআন ঃ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী

(১৯) যাদুল মাআদ ঃ আল্লামা হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ)

(২০) জমউল ফাওয়ায়েদ মিন মাজমায়িল উসুল ওয়া মাজমায়িয যাওয়াঈদ ঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-ফাসী আল মাগরিবী, মৃত্যু ১০৯২ হিজরী

(২১) আল আহকামুন নববিয়্যা ফী সানাআতিত তিব্বিয়্যা ঃ আবুল হাসান আলী ইবনে আব্দুল করীম আলহামদী (মিসর)

(২২) আত্‌তিব্বুন নববী ঃ শামসুদ্দীন ইবনে আবূ বকর ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযী (৬৯১-৭৫১ হিঃ)

(২৩) আল গেযা ওয়াদ দাওয়া ফিল কুরআনিল কারীম ঃ ডাক্তার আবদুল আযীম হানাফী সাবের, মিসর ১৯৭২

(২৪) আত্‌ তিব্বুন নববী ঃ শাখয় আবূ নুয়াইম (রহঃ)

(২৫) কিতাবুল ফাওয়ায়েদ ঃ শায়খ আবুল আববাস শারজী হানফী (রহঃ)

(২৬) আল কওলুল জামীল ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)

(২৭) শরহে মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা ঃ ইমাম যারকানী (রহঃ)

(২৮) সীরাতুননবী ঃ আল্লামা শিবলী নোমানী (রহঃ) মৃত্যু ১৯১৪ সাল

(২৯) রাহমাতুল্লিল আলামীন ঃ কাযী মুহাম্মদ সুলাইমান মনসুরপুরী

(৩০) আখলাকুননবী ঃ শায়খ আবূ হাইয়্যান ইস্পাহানী (রহঃ) মৃত্যু ৩৮৯ হিজরী, অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ, করাচী

(৩১) বিমারী আওর উনকা রূহানী এলাজ ঃ ডাক্তার মীর ওয়ালী উদ্দীন মরহুম

(৩২) তিব্বে নববী পর এক তাহকীকী মাকালা ঃ হাকীম কাযী আবদুল মুজতাবা আরশাদ

(৩৩) তিব্বে নববী ঃ হাফেয ইকরামুদ্দীন

(৩৪) মাজাল্লাহঃ সিহ্হত ও তনদুরস্তী ঃ সম্পাদনা ঃ ডাক্তার মাহবুল আলম

(৩৫) কিতাবুল মুফরাদাত

(৩৬) ইসলাম আওর তিব্বে জাদীদ (প্রবন্ধ) ঃ (প্রবন্ধ) প্রফেসর মুহাম্মদ আলমগীর খান, কওমী সিহ্হত, লাহোর